৬

মানবাধিকার বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ অধিবেশন

এই পর্বে আলোচনা করা হয়েছে নিম্নোক্ত তিনটি মূলভাবের প্রতিটির উপর একটি করে প্রশিক্ষণ অধিবেশন নিয়ে :

(১) বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার;
(২) যৌথ/দলীয় অধিকার; এবং
(৩) অধিকারগুলোর মধ্যে সংঘাত।

প্রতিটি মূলভাবের ক্ষেত্রে, প্রশিক্ষণ অধিবেশনের লক্ষ্য প্রথমে উল্লেখ করা হয়েছে। এরপর একটি তত্ত্বগত ভূমিকার উপস্থাপনার পর রয়েছে প্রস্তাবিত কাজ বা কর্মশালার জন্য আবশ্যিক নির্দেশনা। সাধারণ অধিবেশনের পর, উদ্দীপনাদানকারীর উপসংহার টানার জন্য কিছু ভাবনারও প্রস্তাব করা হয়েছে। উদ্দীপনাদানকারীকে অবশ্যই অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা এবং অন্যান্য পরিস্থিতি ভেদে কাজ বা কর্মশালার এবং সাধারণ সহভাগিতার জন্য সময়সীমা নির্ধারণ করতে হবে। উদ্দীপনাদানকারীর জন্য ভূমিকা উপস্থাপন ও উপসংহার টানার প্রকৃতিও ভিন্ন হবে। যেন **অনেকে এ ধরনের পদ্ধতিগুলোর ব্যবহার ঘটিয়ে প্রাণবন্ত ও অংশগ্রহণধর্মী অধিবেশন পরিচালনা করতে পারে।**

১। বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকার

লক্ষ্য : বিভিন্ন ধরনের মানবাধিকারকে চিহ্নিতকরণ ও এর শ্রেণীবিভাগ

মানবাধিকার বলতে বুঝায় দাবি-দাওয়া, যা সকল মানুষ শুধুমাত্র মানুষ হওয়ার কারণে ন্যায়সঙ্গতভাবে দাবি করার অধিকারী। ১৭ ও ১৮ শতকে, এ মানবাধিকার ধারণা 'প্রাকৃতিক অধিকার' নামে পরিচিত ছিল, এটার দ্বারা বুঝানো হত যে, এ সকল প্রাকৃতিক অধিকারের উৎস হচ্ছে প্রতিটি মানুষের স্বভাব বা প্রকৃতি। ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের স্বাধীনতা ঘোষণাপত্রে 'প্রাকৃতিক অধিকার'-এর ধারণা এ স্মরণীয় বাক্যে প্রকাশ পেয়েছে : *"এ সকল সত্যকে আমরা স্বত:সিদ্ধ বলে স্বীকার করি যে, সব মানুষ সমানভাবে সৃষ্ট, তারা তাদের সৃষ্টিকর্তা কর্তৃক হরণ-অযোগ্য অধিকার দ্বারা ভূষিত,* এ সকল অধিকারের মধ্যে হচ্ছে জীবন, স্বাধীনতা, এবং সুখের অন্বেষণ। এ সকল অধিকার নিশ্চিত করার জন্য, মানুষের মাঝে সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত...। যখনই কোন সরকার এ সকল লক্ষ্যের বিনাশক হয়ে ওঠে, তখন জনগণের অধিকার আছে সে সরকারের পরিবর্তন বা উচ্ছেদ ঘটিয়ে এক নতুন সরকার প্রতিষ্ঠা করার।"

১৭৮৯ খ্রীষ্টাব্দের মানব ও নাগরিক অধিকার ঘোষণাপত্রে, ফ্রান্সের জাতীয় পরিষদও অনুরূপভাবে ঘোষণা করেছে : সকল রাজনৈতিক দলের লক্ষ্য হল, মানুষের প্রাকৃতিক অলঙ্ঘনীয় অধিকার সংরক্ষণ; আর এ সকল অধিকার হচ্ছে স্বাধীনতা, সম্পদ, নিরাপত্তা, এবং নিপীড়ন প্রতিরোধ। ১৯ ও ২০ শতকে, প্রাকৃতিক অধিকার ধারণাটি পাল্টে মানবাধিকার ধারণায় রূপান্তরিত হয়। দুই ধরনের দাবি অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে এই পরিবর্তনটি অধিকারের পরিধি বা পরিধিরি সম্প্রসারণকেই প্রতিফলিত করে। প্রথম তথা প্রাচীন ধরনটি হচ্ছে নেতিবাচক : এটা সরকারের ক্ষমতাকে সীমিত করে, সরকারের ক্ষমতার হাত থেকে জনগণের অধিকারকে রক্ষা করারই জন্য। দ্বিতীয় তথা নতুন ধারণাটি হচ্ছে ইতিবাচক : এটা কিছু করার জন্য লোকদের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে সরকারের ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলে। এইভাবে ২০ শতকের শেষভাগে, মানবাধিকার ধারণা হয়ে দাঁড়ায় ইতিবাচক ও নেতিবাচক

উভয় ধরনভুক্ত, তার অর্থ দাঁড়ায় "কিছু কিছু বিষয় কোন মানুষের প্রতি করা যাবে না এবং কিছু কিছু বিষয় প্রতিটি মানুষের জন্য করতে হবে।"

জাতিসংঘ ১৯৪৮ খ্রীষ্টাব্দে সার্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্র (UDHR) প্রণয়ন করে। অধিকার বিষয়ক প্রাচীন নেতিবাচক দাবি-দাওয়াগুলো UDHR-এর ১-২১ ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ধারাগুলো নির্দেশ করে, কোন সরকার বা সমাজের পক্ষে উচিত হবে না কোন ব্যক্তির প্রতি এমন আচরণ করার যা তার সহজাত রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত অধিকার যেমন বাক্, মুদ্রণ/সংবাদপত্র, সভা, ও ধর্মের স্বাধীনতার অধিকার থেকে তাকে বঞ্চিত করবে। অধিকার বিষয়ক নতুন ইতিবাচক দাবি-দাওয়াগুলো UDHR-এর ২২-২৮ ধারায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এ ধারাগুলো নির্দেশ করে, প্রতিটি সরকার বা সমাজের পক্ষে উচিত হবে বিশেষ সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকার ও সুবিধাদি, যেমন সামাজিক নিরাপত্তা, চাকরি, গৃহায়ন, শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, এবং জীবনধারণের সাধারণ মান ইত্যাদি, ভোগ করার জন্য এর প্রত্যেক সদস্য-সদস্যাকে সক্ষম করে তোলার জন্য কাজ করে যাওয়ার।

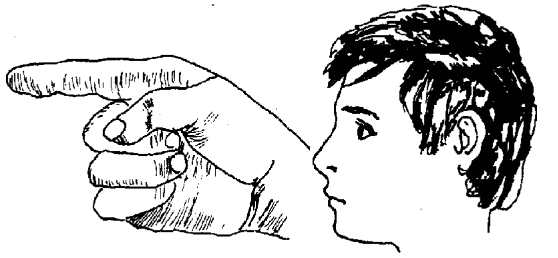

দলীয় অধিবেশনের জন্য কাজ

অংশগ্রহণকারীগণ তাদের সমাজের একটি মানচিত্র সাথে রাখবে এবং প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত অধিকারগুলো উল্লেখ করবে।

সময় : ১ থেকে ২ ঘন্টা, দলের উপর ভিত্তি করে।

উপকরণাদি : চার্ট পেপার, রঙ্গিন মার্কার এবং খঊঔী-এর একটি কপি বা এর একটি সরল সংস্করণ।

কার্য-প্রণালী ও নির্দেশনা

ধাপ ১। যে সব ভিন্ন ভিন্ন জনপদে অংশ-গ্রহণকারীগণের বসবাস তার ভিত্তিতে তাদের ৩-৪টি দলে বিভক্ত করা (উদাহরণস্বরূপ : গ্রাম/শহর, শহরের ধনী/ গ্রামের দরিদ্র, ছোট শহর/জেলা হেডকোয়ার্টার)। তাদের জনপদের একটি মানচিত্র আঁকতে বলা। তারা মানচিত্রে দেখাবে তাদের বাড়ি, গুরুত্বপূর্ণ সরকারী ভবন (পার্ক, স্কুল, উপাসনা স্থল), সরকারী সেবা প্রতিষ্ঠান (ফায়ার ডিপার্টমেন্ট, হাসপাতাল, ইত্যাদি) এবং অন্যান গুরুত্বপূর্ণ স্থানসমূহ, যেমন ফ্যাক্টরি, সিনেমা হল, কবরস্থান, ইত্যাদি)।

ধাপ ২। মানচিত্র অঙ্কন করার পর, অংশগ্রহণকারীদের মানবাধিকার দৃষ্টিকোণ থেকে তাদের চিত্রটি ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ করতে বলা। মানচিত্রে দেখানো বিভিন্ন স্থানগুলোর সঙ্গে তোমরা কি কি মানবাধিকার যুক্ত করতে পার? যেমন, স্কুল হচ্ছে শিক্ষার অধিকারের প্রতীক, অথবা ফ্যাক্টরী হচ্ছে কাজ করার অধিকারের প্রতীক। এ সকল অধিকার উল্লেখ করার পর, অংশগ্রহণকারীবৃন্দ UDHR-এ এ সংক্রান্ত ধারাগুলোর শরণাপন্ন হবে এবং মানচিত্রে সেগুলো লিখবে।

ধাপ ৩। এখন, সকল দলকে একত্রিত হয়ে সমাজে অনুশীলিত মানবাধিকারগুলোর একটি তালিকা প্রস্তুত করার আহ্বান জানাতে হবে। মানচিত্রগুলিকে সমগ্র দলের সামনে রাখা এবং চূড়ান্ত ব্যাখ্যা বা সিদ্ধান্ত প্রদান করা, তবে নীচের এ সকল দিকের প্রতি নজর রেখে এসব করতে হবে :

(ক) একটি মানচিত্রের কোন একটি অংশে কি অধিকারসমূহের অধিকতর সমন্বয় ঘটেছে? কেন?

(খ) মানচিত্রের কোন অংশে কি অল্প কয়েকটি অধিকার সংস্থা আছে বা একেবারে কোন অধিকার সংস্থা নেই? কেন?

(গ) এই সমাজে কি কোন অধিকার বিশেষভাবে অনুশীলিত হচ্ছে? কেন?

(ঘ) কোন অধিকারের কি অনুপস্থিতি ঘটেছে? কেন?

ধাপ ৪। এবার, সমগ্র দলের সামনে বিভিন্ন ধরনের অধিকারগুলোর ব্যাখ্যা প্রদান।

(ক) মানচিত্রে চিহ্নিত কোন্ কোন্ অধিকারগুলো নাগরিক ও রাষ্ট্রীয় অধিকার ?

(খ) কোন্ কোন্ অধিকারগুলো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ?

(গ) কোন্ কোন্ অধিকারগুলো পরিবেশগত, সাংস্কৃতিক ও উন্নয়নধর্মী অধিকার ?

ধাপ ৫। নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলোর অনুসরণে একটি সাধারণ আলোচনা দিয়ে অধিবেশন শেষ করা :

(ক) সমাজে কি এমন কোন স্থান আছে যেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ?

(খ) সমাজে কি এমন কোন লোক আছে যাদের অধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে ?

(গ) কি ঘটে যখন কারোর অধিকার লঙ্ঘিত হয় ?

(ঘ) এই সমাজের লোকেরা কি মানবাধিকার রক্ষায় বা মানবাধিকার লঙ্ঘন প্রতিরোধে এগিয়ে আসে ?

(ঙ) বিভিন্ন অধিকারের মধ্যে কি সংঘাত ঘটে ? উদাহরণ দাও।

উদ্দীপনাদানকারী এই অনুশীলন থেকে আবিষ্কৃত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়সমূহ সংক্ষেপে তুলে ধরে এ পর্ব শেষ করবেন।

২। যৌথ/দলীয় অধিকার

লক্ষ্য : যৌথ/দলীয় অধিকারগুলো চিহ্নিত করা

ভূমিকা : লোকদের ঘৃণা করা অধিকতর সহজ : শুধুমাত্র নিজেকে বুঝানো যে, তারা মানুষের থেকেও অধম, এবং পরে তাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করা। মূল বিষয়টি হচ্ছে, তাদের খারাপ আচরণের জন্য তাদের দোষারোপ করা। উদাহরণস্বরূপ, নারীকে পুরুষের অধীনে রাখা, তাদের বাড়িতে রান্নাঘরে রাখা এবং দাসী-বাদীর ন্যায় আচরণ করা। পরে, দাবি করা যে, তারা সব সময় পুরুষের অধীন, শুধুমাত্র তারা এটা পছন্দ করে ব'লে নয়, কিন্তু তারা কোন কাজে আসে না বলে। আরও ভয়ানক হল, পুরুষ হিসেবে তাদেরকে ক্ষমতার ভয় দেখানো।

আরও রয়েছে যৌথ/দলীয় অধিকার, আর এগুলো ব্যক্তিগত অধিকারের মতই হস্তান্তরে অযোগ্য। নারীর অধিকার, শিশুদের, শ্রমিকদের, দলিতদের, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর, যৌনকর্মীদের , আরও অনেকের অধিকার, এগুলো সবই হচ্ছে মানবাধিকার। প্রতিটি দলের অধিকার আছে এর পরিচয়ের জন্য, এর সংস্কৃতির উন্নয়নসাধনের জন্য, এবং এর ইচ্ছা পূরণের – তবে অবশ্যই তা হতে হবে অন্যদের অধিকারের ক্ষতিসাধন না ক'রে।

একটি সুষ্ঠুধারার গণতন্ত্রের দায়িত্ব হল ব্যক্তি বা দল হিসেবে এর সকল নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করা। বাস্তবিকপক্ষে, ছয় ধরনের অধিকার নিশ্চিতকল্পে গণতান্ত্রিসক শাসন হচ্ছে সর্বোৎকৃষ্ট উপায়।

(১) **সামাজিক অধিকার** : লিঙ্গ, বর্ণ, জাতি, বয়স, পদমর্যাদা, জাতীয়তা, ধর্ম ইত্যাদি নির্বিশেষে সমান স্বীকৃতি, সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার জন্য ব্যক্তির অধিকার; জীবন ও নিরাপত্তার অধিকার। লিঙ্গ বৈষম্য ও অস্পৃশ্যতার বিপরীতে অধিকার; বিনোদন ও অবসরের অধিকার, ইত্যাদি।

(২) **অর্থনৈতিক অধিকার** : খাদ্য, পানীয় জল, বস্ত্র, বাসস্থান, ভূমি, চাকরি, ন্যায্য বেতন, স্বাস্থ্য, এবং পরিবহন, বিদ্যুৎ, পয়ঃনিষ্কাশন, শৌচাগার সুবিধা, ইত্যাদির ন্যায় মৌলিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার; উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক সুযোগ-সুবিধার অধিকার, শিশু শ্রম বিরোধিতা, জোরপূর্বক শ্রম বিরোধিতা, জোরপূর্বক স্থানচ্যুতকরণের বিরোধিতার অধিকার, শ্রমিক, কৃষক, ভূমিহীন শ্রমিক, ভোক্তার অধিকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৩) **রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার** : চিন্তা, মতপ্রকাশ, সংঘ-সমিতি, জনজীবনে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতার অধিকার; পুলিশের হয়রানি ও নির্যাতন, দুর্নীতি, অপরাধের বিপরীতে অধিকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৪) **সাংস্কৃতিক অধিকার** : শিক্ষা, তথ্য, যোগাযোগ, ভাষা, শিল্প, রীতিনীতি ও ঐতিহ্যের অধিকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

(৫) **ধর্মীয় অধিকার :** ধর্মীয় বিশ্বাস ও উপাসনার, নিজ ধর্ম প্রকাশ ও পালন করার স্বাধীনতার অধিকার।

(৬) **পরিবেশগত অধিকার :** একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশ ও দূষণমুক্ত বাতাস ও ভূগর্ভস্থ জলের অধিকার; হয়রানি, নির্যাতন ও প্রাণীসত্তার ক্ষতিসাধনের (পশু, পাখি, বন, ইত্যাদির) বিপরীতে অধিকার, ইত্যাদি ইত্যাদি।

দলীয় অধিবেশনের জন্য কাজ

এই কাজটি এককভাবে বা দলীয়ভাবে করা যেতে পারে।

ধাপ ১। উপরে উল্লিখিত ছয় ধরনের অধিকারের প্রতিটির একটি তালিকা করা। প্রতিটি অধিকারের বিপরীতে, পাঁচটি বাক্য লেখা। *সময় :* ১৫-২০ মিনিট। উদাহরণস্বরূপ, *অর্থনৈতিক অধিকার :* 'আমি অসুস্থ, আমার ডাক্তার দেখানো দরকার।' *রাষ্ট্রীয় অধিকার :* 'আমার বয়স ১৮, আমি ভোটদানে যোগ্য।'

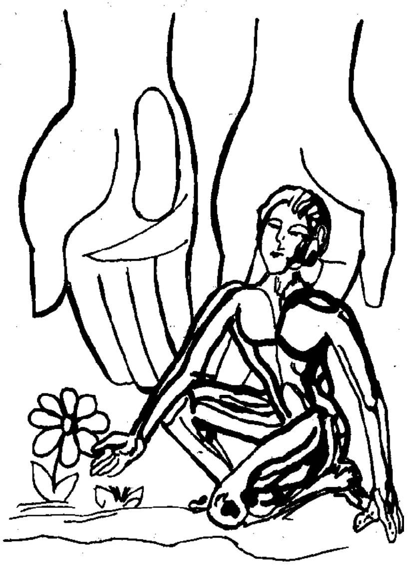

ধাপ ২। একটি সাদা পৃষ্ঠা না ছিঁড়ে মাঝখান বরাবর ভাঁজ ক'রে দু'ভাগে ভাগ করতে হবে। উপরের ভাগে 'অধিকারসমূহ' কথাটি লেখা এবং নীচের ভাগে 'কর্তব্যসমূহ' কথাটি লিখতে হবে। এবার উপরের ভাগকে দুই সরণীতে বিভক্ত করা – একটি সরণীতে 'নিয়োগকারী' ও দ্বিতীয় সরণীতে 'চাকরিজীবী' কথাটি লেখা। একই কাজ করতে হবে নীচের ভাগের পৃষ্ঠার ক্ষেত্রে। এবার যথাক্রমে 'নিয়োগকারী' ও 'চাকরিজীবী'র নীচে অন্তত:পক্ষে পাঁচটি অধিকার ও পাঁচটি কর্তব্য লিখতে বলতে হবে। সময় : ১০ মির্নিট।

ধাপ ৩। দরিদ্র, বাসার কাজের লোক, জেলে, আদিবাসী, নারী, শিশু ও দলিতদের অধিকারগুলো কি কি? প্রতিটির ক্ষেত্রে কমপক্ষে তিনটি অধিকার উল্লেখ করতে বলতে হবে। সময় : ১০-১৫ মিনিট।

প্রতিটি দল বা কয়েকজন অংশগ্রহণকারী কর্তৃক বিভিন্ন যৌথ অধিকারের কথা সহভাগিতা করার পর, উদ্দীপনাদানকারী অধিবেশনের আলোচনার বিষয়বস্তু সংক্ষেপে তুলে ধরবেন।

সারসংক্ষেপ এবং কিছু ভাবনা

মানবাধিকারগুলো মানুষ হিসেবে আমাদের জীবনকে নিরূপণ করে। কারোর জন্মগত অধিকার লঙ্ঘিত হলে, সে ব্যক্তি সমাজে একজন মানুষের ন্যায় বসবাস করতে পারে না। মর্যাদার সাথে বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজন নিজ মানবাধিকারের সম্মান। যখন লোকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হয় আর সে অনুসারে জীবন যাপন করে, তখন তারা মানব মর্যাদা নিয়ে বসবাস করে। আমরা যেমন অন্যদের কাছ থেকে আমাদের অধিকারের প্রতি আমরা পছন্দ ও আশা করি সম্মান প্রদর্শন, একইভাবে আমাদেরও উচিত অন্যদের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা। তাদের অধিকার জোরপূর্বক হরণ করা হলে, অথবা তাদের অধিকারকে অস্বীকার করা হলে, আমাদের করণীয় হবে তাদের অধিকারের জন্য সংগ্রাম করা ও তা পুনরায় ফিরে পেতে তাদের সাহায্য করা। তবেই তো সকলে মানুষ হিসেবে মর্যাদায় বসবাস করতে পারবে। সুতরাং, মানবাধিকার হচ্ছে, আমাদের জন্য একটি সুযোগ, একটি দায়িত্ব ও একটি কর্তব্য – মর্যাদার সাথে বসবাস করার ও আমাদের অধিকারকে রক্ষা করার একটি সুযোগ, অন্যদের অধিকার ও মর্যাদাকে সম্মান করার একটি দায়িত্ব, এবং অন্যদের অধিকার সমর্থন, রক্ষা প্রতিষ্ঠা করার একটি কর্তব্য। আর

তাই, আমাদের নিজেদের অধিকার ও অন্যদের অধিকারের ব্যাপারে আমাদের পুরোপুরি সচেতন থাকতে হবে, যেন আমরা সেগুলো সমর্থন ও রক্ষা করতে পারি।

৩। অধিকারগুলোর মধ্যে সংঘাত

লক্ষ্য : বিভিন্ন অধিকারগুলোর মধ্যে সংঘাতের প্রতি দৃষ্টিপাত

ভূমিকা : মানবাধিকার ও পরিবেশ রক্ষার মধ্যে সংযোগটির স্বীকৃতি ধীরে প্রসারলাভ করছে। একদিকে, সমাজকর্মীরা, পণ্ডিতগণ ও নীতি-নির্ধারকগণ যখন এ দু'টির পরস্পরছেদনে উত্তরোত্তর বিভিন্ন পরিস্থিতির মুখোমুখি হচ্ছেন, তখন পরিবেশগত অধিকার রক্ষার আহ্বান অনেক বেগবান হয়েছে। বিশেষ Rapporteur Fatma Zohra Ksentini কর্তৃক রচিত মানবাধিকার ও পরিবেশের উপর একটি ব্যাপক রিপোর্ট জাতিসংঘের বৈষম্য নিবারণ ও সংখ্যালঘুদের রক্ষা বিষয়ক সাব-কমিশন প্রকাশ করেছে। এখানে মানবাধিকার, পরিবেশ রক্ষা, টেকসই উন্নয়ন ও শান্তির মধ্যে পরস্পরনির্ভরশীলতা ও অবিভাজ্যতা দাবি করা হয়েছে। তখন থেকে, জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক কমিশন Ksentini-র থেকে সংগ্রহ করেছে কতগুলো ধারাবাহিক প্রতিবেদন, যেগুলি ছিল মানবাধিকারের উপর বিষাক্ত ও বিপজ্জনক পণ্য এবং অপচয়ের প্রভাব সংক্রান্ত কম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কেন্দ্রিক। পাশাপাশি, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক আদালত আক্রান্তদের সুযোগ করে দিয়েছে মানবাধিকারের লঙ্ঘনভিত্তিক বিভিন্ন মামলা নিবন্ধন করার জন্য, যেগুলোর মূল কারণ পরিবেবেশের ক্ষতিসাধন; এছাড়া কয়েকটি জাতীয় আদালত গ্রহণ করেছে কিছু কর্মোদ্যোগ যেগুলি একটি সুষ্ঠু পরিবেশের অধিকারের লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার।

এগুলোর অগ্রগতি সত্ত্বেও, কোন বাধ্যতামূলক আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রধান লক্ষ্য হিসেবে পরিবেশ বিষয়ক অধিকারগ্রহণ করা হয়নি। বিষয়টি এখনো অমনোযোগের তিমিরেই রয়ে গিয়েছে, কারণ এটা মানবাধিকার আন্দোলন বা পরিবেশগত আন্দোলনের আলোচ্যসূচীতে নিজেকে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থ হয়েছে। অল্প কয়েকটি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলির কার্যক্রম পরিবেশের অধিকারভিত্তিক। একইভাবে, পরিবেশগত আন্দোলনগুলো সাধারণত: অধিকতর মানবকেন্দ্রিক দিকসমূহের উপর আলোকপাত করে না, যেগুলির মধ্যে সামাজিক ন্যায্যতার বিষয়সমূহ রয়েছে, যেমন বিষাক্ত শিল্প কলকারখানায় কর্মরত দরিদ্র শ্রেণী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী ও সংখ্যালঘু সম্প্রদ্রায়গুলোর অনুপাতহীন দুঃখ-কষ্ট।

একটি কেস স্টাডি : শ্রমিকদের অধিকার ও দুর্নীতি দমন (দিল্লী)

ভারতে সাংবিধানিক অধিকারের আইনী ব্যাখ্যায় পরিবেশগত মূল্যবোধ ও মানবাধিকারের মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ সংযোগ বিদ্যমান। তথাপি, কিছু কিছু উদাহরণে, আদালতের মামলাগুলো, একটি পরিচ্ছন্ন পরিবেশের অধিকার সংরক্ষণ ক'রে মূলত: বিপন্ন করে তুলেছে, ভারতের সর্বাপেক্ষা হতদরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর মানুষদের কর্ম নিরাপত্তা এবং এটা মানবাধিকারের অপব্যবহারের দিকে চালিত করেছে। এরকম একটি দৃষ্টান্ত হচ্ছে, ১৯৯৫ খ্রীষ্টাব্দে এম.সি মেহতা ও ইউনিয়ন অব ইণ্ডিয়ার মধ্যে সুপ্রিম কোর্ট মামলা। এ মামলায় কোর্ট দিল্লির দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-কলকারখানাগুলো বন্ধ করার ও অন্যত্র সরিয়ে নেওয়ার রায় দিয়েছিল। এই দৃষ্টান্তে, কোর্ট দূষণ বন্ধের মধ্যশ্রেণীর আবেদনে সংবিধানের জীবনের অধিকার নীতির বিস্তর ব্যাখ্যা দিয়ে সাড়া দিয়েছিল, তবে একই সময়ে এ রায়ের বাস্তবায়ন নগরীর হাজার হাজার হতদরিদ্র শ্রমিকদের জীবনে বিরূপ প্রভাব ফেলেছিল।

এ ঘটনায় পরিবেশবাদী আইনজীবি এম.সি. মেহতা যুক্তিতর্কের মাধ্যমে দেখিয়েছেন যে, দিল্লির শিল্প-কলকারখানা এবং সরকারি এজেন্সিগুলো দিল্লী মাস্টার

প্লানে নির্দেশিত নগর পরিকল্পনার নিয়মনীতি মেনে চলছে না। ১৯৯০ এর পরিকল্পনা নগরীকে বিভিন্ন বিচ্ছিন্ন অঞ্চলে বিভক্ত করে এবং এসব অঞ্চলের অনেকগুলিতে ঝুঁকিপূর্ণ ও ছোটখাটো শিল্প-কলকারখানা কার্যক্রম নিষিদ্ধ করে। ভারতীয় সুপ্রিম কোর্ট মেহতার পক্ষে রায় দিয়ে শত শত শিল্প-কলকারখানাকে নির্দেশ দিয়েছিল সেগুলোকে মহানগরীর চৌহদ্দির বাইরে সরিয়ে নেওয়ার। এ রায় থেকে এমন ধারণা জাগে যে, এর নেপথ্য উদ্দেশ্য বাতাস ও জলের বিশুদ্ধকরণে শহরের দরিদ্র লোকদের নগরীশূন্য করা। বাস্তবিকপক্ষে আদালত লক্ষ্য করেছিল : নগরী পরিণত হয়েছে বাণিজ্যিক, শিল্প, ও অনুমোদনহীন কলোনীর একটি বিশাল ও নিয়ন্ত্রণাতীত স্তূপে... আর অপরিকল্পিত গৃহায়নের ফলে উন্মুক্ত স্থান ও সবুজ মাঠের অভাব। একদার সুন্দর নগরী দিল্লী এখন একটি বিশৃঙ্খল চিত্র। রাজধানী নগরীকে বিশাল বাড়তি বোঝা ও চাপমুক্ত করার একমাত্র পথ হচ্ছে নগরীতে জনসংখ্যা, শিল্প-কলকারখানা ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডকে অন্যত্র সরিয়ে নেওয়া। অধিকন্তু বিচারকমণ্ডলী কেন্দ্রিয় দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ড ও দিল্লি দূষণ নিয়ন্ত্রণ কমিটিকে আদেশ দিয়েছিল নগরীতে সকল ঝুঁকিপূর্ণ ও পরিকল্পনাহীনভাবে গড়ে ওঠা শিল্প-কারখানাগুলো সনাক্ত করার। সামান্য কিছু সহায়ক তথ্যের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রণ বোর্ডগুলো বিশাল একটা তালিকা প্রস্তুত করে, যেখানে ১৬৮টি ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-কলকারখানার নামোল্লেখ ক'রে সেগুলি বন্ধ করে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়। এগুলি বন্ধ করে দেওয়ার মাধ্যমে নেতিবাচক প্রভাবগুলো কমিয়ে আনার প্রচেষ্টায়, বিচারকমণ্ডলী শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা অন্তর্ভুক্ত করে, উদাহরণস্বরূপ, আদেশে বলা হয় যে, স্থানান্তরিত শিল্প-কলকারখানাগুলোর মালিকগণ তাদের শ্রমিকদের কাজে বহাল রাখবে, পূর্ণ বেতন প্রদান করবে, এবং একইভাবে স্থানান্তরের বোনাস হিসেবে এক বছরের বেতন প্রদান করবে। যে সমস্ত কল-কারখানাগুলো স্থানান্তরিত না হয়ে বন্ধ হয়ে যাবে সেগুলোর শ্রমিকদের এক বছরের বেতন প্রদান করতে হবে। খুব শীঘ্রই গণমাধ্যমে খবর হয় যে, কোম্পানীগুলো তাদের শ্রমিকদের রায় মত মজুরী ও ক্ষতিপূরণ দিচ্ছে না। ১৯৯৬ খ্রীষ্টাব্দের গোড়ার দিকে বিড়লা টেক্সটাইল এর ২,৮০০ জন শ্রমিকদের ছাঁটাই করার অভিমত প্রকাশ করলে, বিচারকমণ্ডলী আরও আদেশ করেছিলেন, স্থানান্তরিত না হয়ে বন্ধ হয়ে যাওয়া শিল্প-কলকারখানাগুলো তাদের শ্রমিকদের এক বছরের পরিবর্তে ছয় বছরের পূর্ণ বেতন প্রদান করবে। কোর্ট সেই সাথে যারা আবাসিক কোয়াটারে কাজ করে তাদের জন্যও কিছু সুবিধার অন্তর্ভুক্ত করেছিল।

বন্ধ হয়ে যাওয়ার ফলে বেকার শ্রমিকদের আবেদনের সাড়া দিয়ে বিচারকগণ শিল্প মালিকদের আদেশ দিয়েছিলেন তাদের জন্য নতুন কাজের ব্যবস্থা করার বা অন্য ফ্যাক্টরিতে তাদের ঢুকিয়ে নেওয়ার। তবে, দিল্লিভিত্তিক এক সমাজকর্মীর গবেষণা থেকে জানা যায় যে, বেতন ও ক্ষতিপূরণ প্রদানের আদেশকে পাশ কাটিয়ে গিয়ে অস্থায়ী কর্মীদের ছাটাই কিংবা স্থায়ী কর্মচারীদের ছোট একটি অংশকে নতুন জায়গায় বদলী করাটা শিল্প মালিকদের নিকট সহজ মনে হয়েছে। একটি স্থানীয় এনজিও কর্তৃক পরিচালিত জরিপে দেখা যায় যে, ১৬৮টি ঝুঁকিপূর্ণ কলকারখানার মধ্যে ১০০টি কলকারখানার ১২,৬৬৮ জন শ্রমিক তাদের কর্মসংস্থান হারিয়েছে। সর্বোপরি, হিসেবে দেখা যায় যে, দিল্লিতে ২,৫০,০০০ এর বেশী লোক (শ্রমিক ও তাদের পরিবার-পরিজন নিয়ে) কর্মসংস্থান হারানোর প্রত্যক্ষ ফল ভোগ করে।

এ সকল সমস্যার কোন সুরাহা না করে, ২০০১ খ্রীষ্টাব্দে পরিস্থিতি আরও অবনতি ঘটে, যখন আদালত এটা আবাসিক এলাকায় অবস্থিত ও মাস্টার প্লানের সঙ্গে সঙ্গতিহীন সকল দূষণ ও অদূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প-কলকারখানাগুলো বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দেয়। দিল্লি প্রশাসন ও পুলিশ বাহিনী ১,৯৭৬টি স্থাপনা সিল করে দিলে বেকার হয়ে পড়া কর্মীদের সংখ্যা বহুগুণে বেড়ে যায়। বন্ধের এই সর্বশেষ ঢেউ রাস্তায় ও রাজনৈতিক র‍্যালিতে ব্যাপক আন্দোলনকে উস্‌কে দিয়েছিল। গণমাধ্যমগুলো রিপোর্ট করে যে, দু'টি ফ্যাক্টরির মালিক আত্মহত্যা করেছেন, অনেকে দেউলিয়া হয়েছেন।

দানিয়েল মিডোজের সঙ্গে পুরনো ঝুঁকিপূর্ণ শিল্প-কলকারখানার শ্রমিকদের সঙ্গে মত বিনিময়ে প্রকাশ পায় যে, আদালতের নিরাপত্তামূলক নানা পদক্ষেপ সত্ত্বেও, শ্রমিকদের জীবিকা এখনো অত্যন্ত বিপদগ্রস্ত। অনেক শ্রমিক জানিয়েছে নতুন জায়গায় স্থানান্তরের জন্য তাদেরকে অর্থ পরিশোধ করা হয়নি কিংবা কাজও দেওয়া হয়নি। স্থানান্তরিত না হয়ে যেগুলো বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলোর শ্রমিকরা তাদের প্রাপ্য মজুরীর মাত্র অর্ধেক পেয়েছে। তবে, যখন জিজ্ঞেস করা হয়েছিল কোর্টের আদেশ মত তাদেরকে পরিশোধ করা হয়েছে কি-না, তখন তারা জানায় যে এ সকল সুযোগ-সুবিধার কথা তাদের জানাই ছিল না। সর্বোপরি, অনেকে ছিল অনিয়মিত বা অস্থায়ী কর্মচারী যাদের নাম কোম্পানীর বেতন খাতায় ছিল না। কোর্টের উদ্যোগগুলো এই শ্রমিক শ্রেণীর কোন প্রতিকার না করায় ফ্যাক্টরী মালিকগণ কোন রকম বেতন প্রদান ছাড়াই সহজে তাদেরকে কাজ থেকে বরখাস্ত করতে পেরেছে। বন্ধ করে দেওয়ার সমগ্র প্রক্রিয়া জুড়ে, আদালত এবং সরকারি এজেন্সীগুলো সকল শ্রমিক শ্রেণীর দাবি-দাওয়া নথিভুক্তকরণের এবং আদালতের রায় বাস্তবায়নের ফ্যাক্টরি মালিকগণের সম্মতি নিশ্চিতকরণের কোন কার্যবিধি প্রণয়ন করতে পারেনি। জিজ্ঞেস করা হলে, সরকারি কর্মকর্তাগণ বেতন ও ক্ষতিপূরণ প্রদান বিষয়ক আদালতের রায়ের প্রতি শিল্পমালিকগণের সম্মতিজ্ঞাপনমূলক প্রমাণ করে এরূপ কোন রেকর্ড দেখাতে পারেনি।

জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার পরিবর্তে, এই ঘটনা শিল্পখাতে ও সরকারে শক্তিশালী স্বার্থান্বেষী মহলকে তাদের নিজেদের সুবিধায় একটি দূষণ প্রতিরোধ নীতি ব্যবহারের সুযোগ করে দিয়েছিল : দূষণ নিয়ন্ত্রণ বোর্ডগুলো কোন রকম স্বচ্ছতা ছাড়াই শিল্প-কলকারখানাগুলোর একটি বড় তালিকা উপস্থাপন করলে, দিল্লীর অনেক শিল্পমালিক শ্রমবল কমিয়ে আনে, বেতন কমিয়ে দেয়, এবং মূল্যবান সম্পদ বিক্রি করে ফেলে। তবে, এই ঘটনা পরিবেশের অবস্থার উন্নয়নে কমই অবদান রাখে, কেননা এটা দূষণ সৃষ্টিকারী শিল্প প্রতিষ্ঠাগুলোকে নতুন জায়গায় স্থানান্তরিত করেছিল মাত্র। সবশেষে, জীবনের অধিকার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশে এই মামলা শেষ পর্যন্ত সেই খোদ অধিকারকেই শ্রমিকদের উপর এর নেতিবাচক প্রভাবের মাধ্যমে দুর্বল করে দেয়।

ভারতীয় বিভিন্ন বে-সরকারী সংস্থাগুলো বিভিন্ন নীতিমালা ও প্রকল্পের বিরুদ্ধাচরণ করে, কেননা এগুলো সামঞ্জস্যহীনভাবে ‘দূষণ প্রতিরোধের’ নামে হতদরিদ্র শ্রমিক শ্রেণীর দুর্ভোগ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের আয়োজিত বিভিন্ন সেমিনার, প্রতিবাদ সভা ও আইনী মধ্যস্থতা কার্যক্রমগুলি শিল্পখাত, যেগুলো শ্রমিক শ্রেণী, মধ্যবিত্ত ও পরিবেশের উপর প্রভাব ফেলে, সেগুলোকে সঠিক নিয়ন্ত্রণ ও পর্যবেক্ষণের অভাবকেই দায়ী করে। সরকারী নিয়ন্ত্রক এজেন্সীগুলো এবং সুপ্রিম কোর্ট যদি শিল্পমালিক কর্তৃক শ্রমিকদের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণ অধিকার লঙ্ঘিত হতে দেয়, তাহলে অনেকের স্বাস্থ্য ও জীবিকা ঝুঁকির মধ্যেই থেকে যাবে।

সারসংক্ষেপ এবং কিছু ভাবনা

আজকের জগতে, যেখানে সাংস্কৃতিক পরিচয় অনিশ্চিত বা পরিবর্তনশীল, আর দাবি করে বহুজাতিক সস্যপদ এবং যেখানে অর্থনৈতিক কাঠামো গঠিত হয় আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় শক্তির দ্বারা, সেখানে স্থানীয় সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণভার স্থানীয় পর্যায়ের এ সকল সম্পদের ভোক্তাদের হাতে থাকে না বললেই চলে। মৌলিক পরিবেশগত মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যক্তি ও দলীয় প্রচেষ্টাগুলোর সঙ্গে অনেক সময় প্রাকৃতিক সম্পদের নিয়ন্ত্রণকে ঘিরে ব্যাপকভিত্তিক সরকারী প্রচেষ্টার সঙ্গে সংঘাত বাঁধে। যখন কোন রকম দরদস্তুর বা ক্ষতিপূরণ ছাড়াই রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান ও কার্যক্রমগুলো সম্পদের নিয়ন্ত্রণভার অধিগ্রহণ করে, বা যখন এগুলো জেনেশুনেই একটি সাংস্কৃতিক জীবনধারাকে লালনকারী সম্পদের ক্ষতিসাধন করে, তখন এ ধরনের সংঘাতকে

পরিবেশগত মানবাধিকারের কদাচার বলে উল্লেখ করা যেতে পারে। এটাও এক ধরনের কদাচার যখন সেগুলো পরিবেশের মর্যাদাহানি ঘটায় এবং ব্যক্তি ও জনগণকে বেকারত্বের ঝুঁকির মধ্যে ফেলে দেয়।

পরিবেশগত মানবাধিকারের কদাচার থেকে জন্ম নেওয়া সামাজিক সংঘাতগুলোর সঙ্গে অত্যাবশ্যকীয়তা, নৈতিক কর্তব্য এবং অংশগ্রহণধর্মী প্রক্রিয়ার মত প্রশ্নগুলো জড়িত। সম্পদের ব্যবহারকে ঘিরে সিদ্ধান্ত নেওয়ার অধিকার কার আছে – রাষ্ট্রের না আক্রান্ত সমাজগুলোর ? উন্নয়ন ও অন্যান্য বিষয়ের গঠনে কারা অংশগ্রহণ করে ? ক্ষতিসাধিত পরিবেশের আগের অবস্থা ফিরিয়ে আনা এবং অধিকার বা মর্যাদাহানির শিকার জনগণ ও সমাজকে শোভনীয় ক্ষতিপূরণ প্রদান ও প্রতিকার করার জন্য কে দায়ী ? মানব পরিবেশগত সংকট, যেগুলোর দায়ভার বর্তায় বিগত সরকারগুলোর উপর, সেগুলোর প্রতি আমরা কিভাবে সাড়া দিই ? ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থাসমূহ যে সামাজিক দিক থেকে ন্যায়সঙ্গত তা নির্ধারণের ভিত্তিই-বা কী ? এ সকল প্রশ্ন প্রতিফলিত করে একটি 'দায়িত্বের অভাবকে', যা জন্ম নেয় আমাদের অধুনা রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক সরকার ব্যবস্থা থেকে। আর যারা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে এবং যারা অদূরদর্শী নীতি সিদ্ধান্তের মূল্য পরিশোধ করে তাদের মধ্যে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ভৌগোলিক দূরত্ব দ্বারা বিশেষভাবে চিহ্নিত করে।

নাগরিক সমাজের সংগঠন ও নেটওয়ার্ককে দায়িত্বশীল পক্ষগুলোর মুখোমুখি হওয়ার মাধ্যমে দায়িত্বের অভাবের মধ্যে সেতুবন্ধন রচনার একটি প্রয়াস হিসেবে দেখা যেতে পারে। সাধারণত যেমনটি ঘটে, জীবনের জন্য হুমকিস্বরূপ পরিস্থিতিগুলো লোকদের অনুপ্রাণিত করে প্রশ্ন করতে, কর্তৃপক্ষের মুখোমুখি হতে, এবং জবাবদিহিতা দাবি করতে। ক্রবর্ধমানহারে, আক্রান্ত সমাজগুলো ও এগুলোর সমর্থকগণ নেতাদের অপরাধ স্বীকার করে নিতে, উপস্থিত মানবাধিকারের কদাচার বন্ধ করতে আন্তর্জাতিক ও আঞ্চলিক মানবাধিকার হাতিয়ার এবং জাতীয় আইনের দ্বারস্থ হচ্ছে।

বিশ্ব সম্পদের শোষণ এবং জীবমণ্ডলের মর্যাদাহানি প্রকট হওয়ার কারণে, বিভিন্ন সামাজিক আন্দোলন জীবনের অগ্রাধিকার ও উপায়গুলিকে পুনঃগঠিত করার লক্ষ্যে উত্তরোত্তর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। রাজনৈতিক কর্ম অদূরদর্শী কিংবা সুস্থিত পরিবর্তন যাই বয়ে আনুক না কেন, তা মূলত: নির্ভর করে ক্ষমতার কাঠামোগত পরিকল্পনার উপর, আর এই পরিকল্পনারই মধ্যে ফোরামে ব্যক্তিবর্গ ও দলগুলির তাদের অভিমত প্রকাশের ও প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ থাকবে এবং এ সকল ফোরাম মানবাধিকার ও পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য প্রকৃতিকে সম্মান করবে।

উপরোক্ত কেস স্টাডিটি হচ্ছে, মানবাধিকার ও পরিবেশবাদের মধ্যে দ্বন্দ্বের একটা বিরল উদাহরণ। যখন আমরা সুবিধাবঞ্চিত দলগুলো, যেগুলো বিষাক্ত আবর্জনার কারণে ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের কথা শুনতে শুনতে অভ্যস্ত, তখন এই উদাহরণে দরিদ্র এবং নাগরিক অধিকার বঞ্চিতরা মধ্যশ্রেণী সমর্থিত শিল্প দূষণ প্রতিকারমূলক নানা প্রচেষ্টার কারণে ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। ভারতীয় মধ্যশ্রেণী আর পাশ্চাত্যের পর্যবেক্ষকরা যখন সুপ্রিম কোর্টের জাস্টিস কুলদীপ সিংহকে 'সবুজ বিচারক' বলে আখ্যায়িত করেছিল, তখন সমালোচকরা দাবি করেছিল যে, একমাত্র দূষণটি, যা কি-না সত্যি সত্যিই নগরীর বাইরে স্থানান্তরিত হয়েছিল, তা হচ্ছে ঝুঁপড়ি আর বস্তির কুৎসিত চিত্র। সমস্যার বাস্তব সমাধান হচ্ছে, শ্রমিকদের সিদ্ধান্তগ্রহণ প্রক্রিয়ায় অন্তর্ভুক্তকরণ। এমনকি জনস্বার্থ দূষণ প্রতিরোধের পক্ষে গেলেও, সমস্যাটির সমাধান হবে শিল্প-কলকারখানাগুলোকে নগীর বাইরে কিছু জায়গায় স্থানান্তরিত করা অপেক্ষা সেগুলোর দূষণ নিয়ন্ত্রণ প্রযুক্তি ব্যবহার করার।

৭
খ্রীষ্টমণ্ডলী ও মানবাধিকার

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষা (STC) বিশেষভাবে মানবাধিকারে সুসমৃদ্ধ। কাজেই এখানে এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা খুবই প্রাসঙ্গিক হবে। আমাদের আলোচনা আলোকপাত করবে কাথলিক মণ্ডলীর শিক্ষার উপর, এছাড়াও মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদের (WCC) শিক্ষাগুলোও বিবেচনা করে দেখা হবে। এ আলোচনাকে পাঁচটি অংশে ভাগ করা হয়েছে।

অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী ও ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদীগণ STC এর গুরুত্বপূর্ণ দিককে আরও ভালমত জানার ক্ষেত্রে এ আলোচনাকে সহায়ক বোধ করবেন। তাদের নিজস্ব উপলব্ধি বা দর্শনকে শাণিত করা ছাড়াও এ আলোচনা তাদের খ্রীষ্টীয় বন্ধু-বান্ধব ও সহযোগিদের মানবাধিকার শিক্ষা ও সংগ্রামে আরও কার্যকরভাবে সম্পৃক্ত হওয়ার জন্য উদাত্ত আহ্বান জানাতে তাদের উদ্বুদ্ধ করবে।

১। খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার (STC) প্রাসঙ্গিকতা

মানবাধিকার, ন্যায্যতা ও শান্তি এবং বিশ্বের রূপান্তরসাধনের জন্য কাজ করে যাওয়া খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রেরণদায়িত্বের একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। এই সামাজিক দায়িত্বে অংশগ্রহণ অনেক ভিন্ন ভিন্ন উপায়ে অনুসৃত হয়েছে, অর্থাৎ দানশীল কর্মকাণ্ড ও কল্যাণমুখী সুযোগসুবিধা থেকে আরম্ভ করে স্বাস্থ্য ও শিক্ষা সেবা এবং উন্নয়নধর্মী কাজ ও সামাজিক ন্যায্যতাকে সমর্থন যোগানো পর্যন্ত। হতদরিদ্র ও বঞ্চিতদের সাহচর্যে থেকে তাদের সেবা করার চেষ্টার অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে, অনেক মাণ্ডলিক প্রতিষ্ঠান অন্যায্যতার কারণগুলোর বিচার-বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছে, কেননা এ সকল অন্যায্যতা নানা ধরনের পরিস্থিতির জন্ম দেয়, যেমন দরিদ্রতা, অসমতা, বহিষ্কার ও শক্তিহীনতা এবং এগুলোকে সহায়তাকারী অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কাঠামোসমূহ। এই উপলব্ধির প্রতিফলন ঘটেছে মৌলিক কাঠামোয় একটি পরিবর্তনে সাহায্য থেকে ব্যক্তির সার্বিক উন্নয়নে, কল্যাণমুখী কাজ থেকে সামাজিক ন্যায্যতার সমর্থনে। আর এই পরিবর্তনকে STC স্বয়ং অনুপ্রাণিত করেছে।

অনুধ্যানের জন্য নীতিমালার, বিচারের জন্য মানদণ্ডের এবং কাজের জন্য দিকনির্দেশনা যোগানোর লক্ষ্যে STC ধর্মশাস্ত্রের, কালের প্রবাহে খ্রীষ্টীয় সমাজগুলোর অভিজ্ঞতার, মাণ্ডলিক নেতৃবৃন্দের শিক্ষার, এবং অন্যান্য ধর্মীয় ও সাধারণ উৎসের শরণাপন্ন হয়েছে। এই গতিশীল ও সুসংবদ্ধভাবে গড়ে ওঠা ঐতিহ্য বিশ্বাস-অনুপ্রাণিত সম্পৃক্ততার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ। STC দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার পর (১৯৬২-১৯৬৫) প্রতিষ্ঠিত জাতীয় ও ধর্মপ্রদেশীয় ন্যায্যতা ও শান্তি বিষয়ক কমিশনের জন্য দর্শন ও ভিত্তির ব্যবস্থা করেছে, ধর্মসম্প্রদায়গুলোর অনেক সেবাকর্মকে এটা উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করেছে, আর এখন মণ্ডলীভিত্তিক অনেক উন্নয়ন এজেন্সী কর্তৃক এর ব্যবহার দিনকে দিন বেড়েই চলেছে।

খ্রীষ্টীয় নাগরিক সমাজ কর্মীদের সামাজিক কর্মের সক্রিয় সমর্থন সত্যিকার খ্রীষ্টীয় হওয়ার লক্ষ্যে অবশ্যই খ্রীষ্টমণ্ডলীর নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে। তথাপি, বহুত্ববাদী জগতে যেন সঠিকভাবে বুঝা হয় এবং সিদ্ধান্ত-প্রণয়নকারী ও প্রতিষ্ঠানগুলোর উপর যেন প্রভাব ফেলতে পারে সে লক্ষ্যে, সামাজিক কর্মের সক্রিয় সমর্থন অবশ্যই ঐশতাত্ত্বিক নয় কিন্তু মানবাধিকারের ভাষা ব্যবহার করবে। এশিয়া মহাদেশে খ্রীষ্টীয় সামাজিক ন্যায্যতার সমর্থনের উপর আর

অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক বিষয়সমুহকে ঘিরে মানবাধিকারভিত্তিক কার্যক্রমের উপর সাম্প্রতিক নানা কর্মশালা থেকে একটি দাবি বেরিয়ে এসেছে, আর তা হল মানবাধিকার শিক্ষা ও STC এর মধ্যে সম্পর্ককে ভালমত বুঝা ও ব্যাখ্যা করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। আরও প্রয়োজন রয়েছে এ ধরনের নৈতিক ঐতিহ্যসমূহকে বাস্তব বিভিন্ন বিষয়, যেগুলো সমাজের সুবিধাবঞ্চিত লোকেরা মুখোমুখি হয়, সেগুলোর সঙ্গে ভালমত সংযুক্ত করার।

পোপ ত্রয়োদশ লিও'র সার্বজনীন পত্র Rerum Novarum (১৮৯১), কোন পোপের এটাই প্রথম সার্বজনীন পত্র, এর অন্তর্নিহিত ভাবদর্শনগত পক্ষপাত ও ঐশতাত্ত্বিক যুক্তিবুদ্ধি থেকে উৎসারিত নানা দুর্বলতা সত্ত্বেও অগ্রদূত হিসেবে প্রমাণিত হয়েছে। এ সার্বজনীন পত্র সামাজিক সম্পৃক্ততার জগতে মণ্ডলীর প্রবেশকে সূচিত করে। প্রথম ৭০ বছরে, কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনা শিল্পায়িত পাশ্চাত্য জগতের সামাজিক সমস্যা নিয়ে প্রায় সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত ছিল। মাত্র বিগত ৪০ বছর, অর্থাৎ পোপ ২৩ যোহনের Mater et Magistra নামক সার্বজনীন পত্রের সময়কাল থেকেই, কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনা বিশ্বজনীন বিষয় নিয়ে ভাবতে শুরু করেছে।

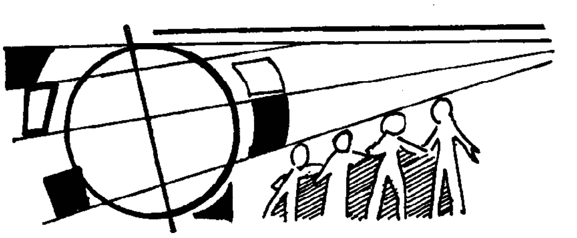

এর বিশ্বজনীন দৃষ্টিভঙ্গি থাকা সত্ত্বেও, এ কথা অবশ্যই স্বীকার করতে হয় যে, কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনা এশীয় মহাদেশে তেমন গ্রহণযোগ্যতা লাভ করতে পারেনি। এর নেপথ্য কারণ দুটি :

প্রথমত:, সামগ্রিকভাবে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনা যে সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট থেকে জন্ম, সেই প্রেক্ষাপটে বন্দী হয়ে থাকাটা অব্যাহত রেখেছে। এর ধ্যানধারণাগুলো এখনো পাশ্চাত্য বুদ্ধিগত ও ঐশতাত্ত্বিক ধ্যানধারণা প্রভাবিত, যা কি-না এশিয়ার মানুষদের নিকট বিদেশী। এটা কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনার ঐশ্বর্যকে এশীয় বাস্তবতায় যথাযোগ্যরূপে মুখোমুখি ও আত্মস্থ হওয়া থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে।

দ্বিতীয়ত:, কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক ভাবনা, এশীয় সংস্কৃতির সামাজিক প্রজ্ঞাকে এখনো পর্যন্ত আত্মস্থ বা আপন করে নেয়নি। যুগ পরম্পরায় পরিমার্জিত ও গঠিত এশিয়ার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি ও দর্শনের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য বাস্তবসম্মতভাবে মানব অস্তিত্বের প্রতিটি দিককে আপন করে নিয়েছে। তবে, যখন কেউ এশিয়ার ধর্মীয় সাহিত্যে কাথলিক মণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার অনুরূপ কোন পরিপাটিভাবে বিন্যস্ত সামাজিক শিক্ষার রচনাবলীর খোঁজ করে, তখন তার অন্বেষণ বৃথাই যায়। এশিয়ার জনমণ্ডলী ও STC-কে অবশ্যই একে-অপরের সঙ্গে সংলাপে প্রবেশ করতে হবে। আর এই বিনিময় থেকে উভয়ই লাভবান হবে।

২। মানবাধিকার বিষয়ক কিছু গুরুত্বপূর্ণ STC দলিল এবং মুলভাব

এই পর্যায়ে আলোকপাত করা হবে সাধারণভাবে ও সরাসরি মানবাধিকার সম্পর্কে বলে এমন কয়েকটি STC দলিল এবং মূলভাবের উপর। তাই, শ্রমিক, দলিত, নারী ইত্যাদির অধিকার নিয়ে আমরা আলোচনা করব না।

ক। পৃথিবীতে শান্তি

পৃথিবীতে শান্তি (Pacem in Terris) হচ্ছে, ১৯৬৩ খ্রীষ্টাব্দে পোপ ২৩ যোহনের রচনাকর্ম, যা কিউবার মিসাইল ক্রাইসিস (১৯৬২) ও বার্লিন ওয়াল নির্মাণের কিছুকাল পরেই রচিত হয়েছিল। এটাই হচ্ছে, প্রথম পত্র যেখানে একজন পোপ 'সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষদের" সম্বোধন করেছেন এবং সকলকে আহ্বান জানিয়েছেন ঈশ্বর প্রণীত সামাজিক শৃঙ্খলা মেনে চলে শান্তির জন্য সংগ্রাম করে যাওয়ার জন্য। প্রতিটি মানুষের অধিকারগুলো বিশ্বজনীন ও অলঙ্ঘনীয়। এ সকল অধিকার বিভিন্ন কর্তব্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত (#৯)। এখানে উল্লিখিত কর্তব্যগুলো হচ্ছে :

(১) অন্যদের অধিকার স্বীকার ও সম্মান করা (# ৩০);

(২) পরস্পরের কল্যাণে কাজ করে যাওয়া (#৩১);
(৩) অন্যদের জন্য স্বাধীনভাবে ও দায়িত্বের সাথে কাজ করা (#৩৪);
(৪) সত্যে, ন্যায্যতায়, ভ্রাতৃপ্রেমে ও স্বাধীনতায় সামাজিকভাবে বসবাস করা (#৩৮)।

পোপ ২৩ যোহন কতকগুলো মানবাধিকারের উপর আলোকপাত করেছেন।

(১) জীবনের এবং বেঁচে থাকার উপযুক্ত মানের অধিকার : বিশেষ করে খাদ্য, বস্ত্র, আশ্রয়, বিশ্রাম, চিকিৎসা-সেবা ও সামাজিক কাজ (#১১)।
(২) নৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের অধিকার : এর মধ্যে অন্তর্গত সত্যের সন্ধান ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, তথ্যের ও মৌলিক শিক্ষার স্বাধীনতা (#১২-১৩)।
(৩) পূজোপাসনা করার অধিকার : প্রত্যেক ব্যক্তি তার বিবেক অনুসারে নিভৃতে বা প্রকাশ্যে ঈশ্বরর উপাসনা করার অধিকারী (#১৪)।
(৪) নিজ জীবনাবস্থা বেছে নেওয়ার স্বাধীনতা : পরিবার গঠন বা ধর্মীয় আহ্বানের অনুসরণ। পিতামাতার প্রথম অধিকার হচ্ছে তাদের সন্তানদের প্রতিপালন ও শিক্ষাদান করা।
(৫) অর্থনৈতিক অধিকার : কাজ, নিরাপদ কর্মস্থান, ন্যায্য বেতন ও ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার (#১৮-২২)।
(৬) সভা-সমাবেশ ও সংঘ-সমিতির অধিকার, কেননা মানুষ প্রকৃতিগতভাবে সামাজিক (#২৩)।
(৭) দেশান্তর ও অভিবাসনের অধিকার : প্রতিটি মানুষের অধিকার আছে স্বাধীনভাবে চলাচল ও বসবাস করার (#২৫)।
(৮) রাজনৈতিক অধিকার, আর সেই সাথে জনবিষয়াদিতে অংশগ্রহণের অধিকার, এবং প্রতিটি মানুষের অধিকারের আইনগত নিরাপত্তাবিধানের অধিকার (#২৬-২৭)।

খ। বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী

পোপ ২৩ যোহন সজীব বাতাসের যে বায়ুপ্রবাহ খ্রীষ্টমণ্ডলীতে বইয়ে দিয়েছিলেন তা ধাবিত হয়েছিল দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভার দিকে। ১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত Gaudium et spes (বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী বিষয়ক পালকীয় সংবিধান) নামক সংবিধানটি সম্ভবত সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ STC দলিল। এ সংবিধানের কিছু মূলভাব নীচে আমাদের ভাবনার জন্য তুলে ধরা হল।

উন্নয়ন

উন্নয়নের অধিকার ব্যক্তি ও জাতির একটি মৌলিক মানবাধিকার (#১৫)।

উন্নয়নশীল দেশগুলোকে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক শক্তিসমূহের শিকারে পরিণত করা যাবে না (১৬)।

অগ্রগতির সংকল্পবদ্ধ ইচ্ছা নিয়ে এ সকল দেশ তাদের নিজস্ব পরিচয় গড়ে তুলবে (#১৭)।

সত্যিকার উন্নয়ন বলতে বুঝায়, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সামাজিক ও রাজনৈতিক অংশগ্রহণ উভয়ই (#১৮)।

আধুনিকীকরণ প্রতিটি দেশ বা জাতির মঙ্গলের সেবায় নিয়োজিত থাকবে। একে অবশ্যই সৃষ্টিশীল ও সাংস্কৃতিক দিক থেকে সংবেদনশীল হয়ে উঠতে হবে (#১৯)।

বিদ্যমান অন্যায্যতার মধ্যে অন্তর্গত : অভিবাসী, শ্রমিক ও শরণার্থীদের প্রতি বৈষম্য; ধর্মীয় ও জাতিগত নির্যাতন; মানবাধিকার লঙ্ঘন; হয়রানি; রাজনৈতিক বন্দীদের আইনী সহায়তাদানে অস্বীকৃতি; জীবন-বিরোধী কার্যক্রম (গর্ভপাত, যুদ্ধ); বর্ষীয়ান, অনাথ ও অসুস্থদের অবহেলা (#২৭-২৮)।

খ্রীষ্টমণ্ডলীর সাক্ষ্যদান

খ্রীষ্টমণ্ডলী অবশ্যই ন্যায়বিচারের অনুশীলন করবে। সে অবশ্যই মানবাধিকার সম্মান করবে ও নিজ জীবনে এর প্রয়োগ ঘটাবে।

(১) ভালবাসা, যা অহিংস উদ্যোগ ও কাজের দিকে পরিচালিত হয়, তাকে অগ্রাধিকার প্রদানের মাধ্যমে খ্রীষ্টানদের সাক্ষ্য বহন করতে হবে (#৩৯)।

(২) ন্যায্যতার কথা প্রচারের সাহসী পদক্ষেপকারীদের প্রথমে তাদের নিজেদের ন্যায়নিষ্ঠ হতে হবে। কাজেই, মণ্ডলীর নিজ কর্ম ও জীবনধারা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে (#৪০)।

(৩) মণ্ডলীর মধ্যে অধিকারকে অবশ্যই রক্ষণাবেক্ষণ করতে হবে, উদাহরণস্বরূপ, বেতন,

সামাজিক নিরাপত্তা, উৎকর্ষ সাধন এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্তের অংশগ্রণের অধিকার (#৪১)।

(৪) নারীদেরও থাকবে বিভিন্ন দায়-দায়িত্ব, তারাও মণ্ডলীর ও সমাজ জীবনে অংশগ্রহণ করবে (#৪২)।

(৫) মণ্ডলীতে অন্যান্য অধিকারের মধ্যে হচ্ছে, প্রকাশ ও চিন্তা করার স্বাধীনতা, উপযুক্ত আইনী সহায়তা, এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ (#৪৪-৪৬)।

(৬) মণ্ডলী এমনভাবে জীবনধারণ ও তার বিষয়সম্পদ তদারকি করবে, যেন তার মধ্য দিয়ে দরিদ্রদের নিকট মঙ্গলসমাচার ঘোষিত হয়। সে যদি ধনী ও শক্তিশালীদের মণ্ডলী হয়, তাহলে তার বিশ্বাসযোগ্যতা কমে আসবে (#৪৭)।

(৭) সকলের জীবনধারা (বিশপ, যাজক, ধর্মব্রতধারী ও ধর্মব্রতধারিনী এবং সাধারণ খ্রীষ্টভক্ত) অবশ্যই পরীক্ষা করে দেখতে হবে। যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ ক্ষুধায় জর্জরিত তখন সাদাসিধে জীবন একান্ত আবশ্যক (#৪৮)।

ন্যায্যতার জন্য শিক্ষা

(১) খ্রীষ্টানদের অবশ্যই ব্যক্তিগত ও সামাজিক নীতিবোধ অনুসারে তাদের দৈনন্দিন জীবন অতিবাহিত করার জন্য শিক্ষিত হতে হবে। এমন কাজ ন্যায্যতার প্রতি তাদের বিশেষ অবদানের প্রমাণস্বরূপ (#৪৯)।

(২) ন্যায্যতার জন্য শিক্ষার দাবি হচ্ছে, ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় পাপগুলো স্বীকার করে নেওয়ার মাধ্যমে অন্তরের নবায়ন। এটা ন্যায্যতা, প্রেম ও সরলতায় মানব জীবনধারাকেই এগিয়ে নেয়। পাশাপাশি, এটা সমাজ ও এর মূল্যবোধগুলোর উপর আলোকপাত করার জন্য একটি সমালোচনাধর্মী বোধ গড়ে তোলে এবং যেসব মূল্যবোধ ন্যায্যতার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সেগুলো প্রত্যাখ্যানে লোকদের সাহায্য করে (#৫১)।

(৩) উন্নয়নশীল দেশগুলোতে, শিক্ষা অবশ্যই সমাজের বাস্তব পরিস্থিতিধর্মী জ্ঞানের জন্য বিবেককে জাগ্রত করবে, এবং উন্নতিসাধনের আহ্বান জানাবে (#৫১)।

(৪) এ ধরনের শিক্ষা গণমাধ্যম ও রাজনৈতিক দলগুলো কর্তৃক ইচ্ছে মত ব্যবহৃত হওয়া থেকে লোকদের দূরে সরিয়ে রাখে (#৫২)।

(৫) এই বাস্তবমুখী জ্ঞান অর্জিত হয় অন্যায্য পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার এবং এ সকল অন্যায্য পরিস্থিতির বিপরীতে পদক্ষেপ গ্রহণের মাধ্যমে (#৫৩)।

(৬) ন্যায্যতার জন্য শিক্ষা প্রথমে শুরু হয় পরিবারে, আর পরে তা চলে মণ্ডলীতে, বিদ্যালয়ে ও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে (#৫৪)।

(৭) ন্যায্যতার জন্য শিক্ষা ব্যক্তি ও তার মর্যাদার প্রতি সম্মানকে চিত্তনিষ্ঠ করে (#৫৫)।

(৮) খ্রীষ্টীয় প্রেরণদায়িত্বের দাবি হচ্ছে যেন আমরা সকলের সঙ্গে আন্তরিক সংলাপের মাধ্যমে নির্ভিকচিত্তে অন্যায্যতা বর্জন করে চলি (#৫৭)।

(৯) ধর্মশিক্ষা ন্যায্যতার শিক্ষার সেবা করতে পারে। খ্রীষ্টপ্রসাদ খ্রীষ্টীয়সমাজ গঠন ক'রে একে জনগণের সেবায় প্রতিস্থাপন করে (#৫৮)।

উন্নয়ন ও ন্যায্যতার জন্য সহযোগিতা

(১) মণ্ডলীসমূহের সকল সদস্য-সদস্যা অবশ্যই মানব মর্যাদা ও অধিকার, সামাজিক ন্যায্যতা, শান্তি ও স্বাধীনতার কর্মকাণ্ডে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবে (#৬১-৬২)।

(২) খ্রীষ্টমণ্ডলী সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য আন্তর্জাতিক সহযোগিতার আহ্বান জানায়। কাজেই, সকল সরকারের দায়িত্ব হল :

– জাতিসংঘের মানবাধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্রের সমর্থন যোগানো ও পালন করা (#৬৪)।

– জাতিসংঘের অস্ত্র প্রতিযোগিতা ও অস্ত্র বাণিজ্য রোধ প্রচেষ্টাকে সমর্থন করা এবং শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বন্দ্বের নিরসন করা (#৬৫)।

– দ্বিতীয় উন্নয়ন দশকের লক্ষ্যগুলির উপর জোর দেওয়া, যার মধ্যে পড়ে ধনী দেশসমূহ থেকে উন্নয়নশীল দেশগুলোতে আয় স্থানান্তর, ন্যায্য মূল্য, ধনী দেশগুলো কর্তৃক তাদের বাজার উন্মুক্তকরণ, উন্নয়নশীল দেশগুলো থেকে রপ্তানীর লক্ষ্যে অগ্রাধিকারভিত্তিক আলোচনা; বিশ্বভিত্তিক করধার্যকরণ (#৬৬)।

– ক্ষমতার কেন্দ্রিকরণ পরিবর্তনের লক্ষ্যে কাজ করা যেন উন্নয়নশীল দেশগুলোর অংশগ্রহণ ঘটতে পারে (#৬৭), ইত্যাদি ইত্যাদি।

(গ) Redemptor Hominis

এ পত্রটি হচ্ছে তাঁর পোপীয় দায়িত্বের প্রথম বর্ষে পোপ দ্বিতীয় জন পলের ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রথম বিশ্বজনীন পত্র। এখানে এ বিষয়টির উপর জোর দেওয়া হয়েছে যে, মানবাধিকারের বাস্তবায়নই সামাজিক ও আন্তর্জাতিক শান্তির ভিত্তি। শান্তির অর্থ জনগণের অলঙ্ঘনীয় অধিকারকে সম্মান করা, অপরদিকে যুদ্ধ হচ্ছে এ সকল অধিকারের লঙ্ঘন। মানবাধিকারগুলো অবশ্যই এগুলোর 'চেতনায়' বাস্তবায়িত হতে হবে। জনগণ ও জাতি উভয়ের অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে হবে। সাধারণ মঙ্গল পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয় শুধুমাত্র যখন সকল নাগরিক তাদের অধিকার পরিপূর্ণভাবে ভোগ করে। এর অন্যথা হলে দেখা দেয় সমাজে ভাঙ্গন,কর্তৃত্বের বিরোধিতা, অথবা নির্যাতন ও হুমকিধামকির পরিস্থিতি।

(ঘ) সামাজিক প্রশ্ন – মণ্ডলীর ভাবনা

পোপ দ্বিতীয় জন পল ১৯৮৭ খ্রীষ্টাব্দে তাঁর Sollicitudo Rei Socialis নামক বিশ্বজনীন পত্রে আলোকপাত করেছেন বিশ্বজনীন অর্থনীতিসমূহ আর উন্নয়নশীল ও অধিকতর প্রাচুর্যশীল উভয় দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ মানুষের জীবনে এগুলোর ভয়াবহ প্রভাবের উপর। এখানে তিনি উন্নয়নের মৌলিক দিকের কথা উল্লেখ করেছেন এবং উন্নয়নের পথে বাধাবিপত্তিগুলোকে অভিহিত করেছেন 'পাপের কাঠামো' বলে। মানুষের জীবনকে আরও মানবীয় করে তোলার প্রয়াসে সকলেই পরিবর্তন ও সংহতির প্রতি আহূত। বিগত বছরগুলিতে পোপ মহোদয়গণ সর্বোপরি তাদের বিভিন্ন সফর আর জাতিসংঘে (১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ পল, ১৯৭৯ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জন পল, ইউনেস্কোয় (১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জন পল), আন্তর্জাতিক শ্রম অফিসে (১৯৬৯ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠ পল ও ১৯৮২ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জন পল), এবং কাউন্সিল অফ ইউরোপে (১৯৮৮ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় জন পল) ভাষণের মধ্য দিয়ে মানবাধিকার বিষয়সমূহে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন।

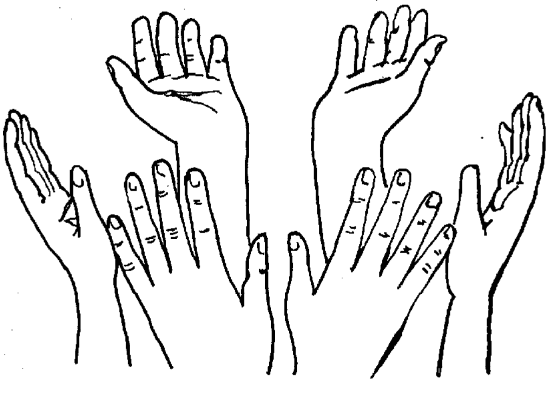

৩। (খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার) সংক্ষিপ্তসারের মানবাধিকার ভাবনা

এ সংক্ষিপ্তসার বিপুল সংখ্যক মানবাধিকারের পাশাপাশি এগুলোর উপরও আলোকপাত করে : সম্পত্তির, স্বাধীনতার, যুক্তিসম্মত বিরোধিতার, প্রতিরোধের, শান্তির, সন্ত্রাস থেকে আত্মরক্ষার, জীবনের, উন্নয়নের, কর্মসংস্থানের, খাদ্যের, জলের, সুষ্ঠু পরিবেশের, অংশগ্রহণের, সিদ্ধান্ত গ্রহণের, সংস্কৃতি বা ভাষার ও ধর্মের অধিকার, এবং ব্যক্তির, প্রতিষ্ঠানের, সংঘ-সমিতি/সংস্থার, ইউনিয়নের, জাতির, রাষ্ট্রের, পরিবার ও সমাজের, শ্রমিকের, অভিবাসীর, শরণার্থীর, হুমকিধীন দলের, নারীর, শিশুর, অভিভাবকের, শারিরীক প্রতিবন্ধীর, সংখ্যালঘুর, নাগরিকের, আদিবাসী জনগোষ্ঠীর ও দরিদ্রদের অধিকার। বাস্তবিকপক্ষে এখানে রয়েছে, প্রায় চার পৃষ্ঠার অধিকার ও অধিকারসমূহের একটি তালিকা। তাই বলা যায় যে, সংক্ষিপ্তসারটি হচ্ছে, তথ্য ও দৃষ্টিভঙ্গির একটি সমৃদ্ধ ভাণ্ডার। এখন আমরা, এ সংক্ষিপ্তসারের প্রথম ভাগের অধ্যায় ৩ : মানব ব্যক্তি ও মানবাধিকার থেকে ৪ অংশ : মানবাধিকার (১৫২-৫৯) হতে নেওয়া কিছু অংশের উপর আলোকপাত করব।

(খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার) সংক্ষিপ্তসার মানবাধিকারের মূল্যবোধের উপর এইভাবে আলোকপাত করে : "মানবাধিকারকে চিহ্নিত ও ঘোষণার লক্ষ্যে আন্দোলন হচ্ছে, মানব মর্যাদার অপরিহার্য দাবি-দাওয়ার প্রতি কার্যকরভাবে সাড়া দেওয়ার জন্য সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ প্রচেষ্টা-গুলোর মধ্যে অন্যতম। আরও কার্যকরভাবে মানবাধিকারের স্বীকৃতি প্রদানের এবং বিশ্বজনীন

পর্যায়ে একে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য খ্রীষ্টমণ্ডলী এ সকল অধিকারের মধ্যে আমাদের আধুনিক কাল প্রদত্ত বিশেষ সুবিধাগুলো দেখতে পায়... । খ্রীষ্টমণ্ডলীর শিক্ষা কর্তৃপক্ষ বিশ্বজনীন মানবাধিকার ঘোষণাপত্রের ইতিবাচক মূল্যবোধকে লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়নি... যে ঘোষণাপত্রকে পোপ দ্বিতীয় জন পল, 'মানবজাতির নৈতিক অগ্রগতির পথে একটি সত্যিকার মাইলফলক' বলে" উল্লেখ করেছেন (১৫২)।

"বাস্তবিকপক্ষে, সব মানুষের মর্যাদার মধ্যেই মানবাধিকারের শিকড়গুলোর সন্ধান মেলে। মানব-জীবনে এবং সমানভাবে প্রতিটি মানুষের মধ্যে নিহিত এই মর্যাদাকে সর্বপ্রথম বিচারবুদ্ধিই উপলব্ধি করতে ও বুঝতে পারে।" মর্যাদা মানবাধিকারের প্রাকৃতিক ভিত্তি। "মানবাধিকারের চূড়ান্ত উৎসের সন্ধান মেলে শুধুমাত্র মানুষের ইচ্ছায়, রাষ্ট্রের বাস্তবতায়, জনশক্তিতে নয়, কিন্তু স্বয়ং মানুষের মধ্যে এবং তার সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের মধ্যে। এ সকল অধিকার 'বিশ্বজনীন, অলঙ্ঘনীয়, অবিচ্ছেদ্য'। বিশ্বজনীন কারণ এগুলো সব মানুষের মধ্যে উপস্থিত। অলঙ্ঘনীয় কারণ 'এগুলো মানুষের মধ্যে ও মানব মর্যাদায় নিহিত' " আর এগুলো "সকল জায়গার সকল মানুষ কর্তৃক, আর সকল মানুষের জন্য" অবশ্যই সম্মানিত হতে হবে। "অবিচ্ছেদ্য, কারণ 'একজন ব্যক্তি, তা তিনি যেই হোন না কেন, আর একজন ব্যক্তিকে এ সকল অধিকার থেকে বৈধভাবে বঞ্চিত করতে পারেন না, কারণ এমনকাজ তার প্রকৃতির পরিপন্থী" (১৫৩)।

"মানবাধিকারগুলোকে শুধুমাত্র এককভাবে নয় কিন্তু সম্মিলিতভাবে রক্ষা করতে হবে : এগুলোর শুধুমাত্র আংশিকভাবে রক্ষা করার অর্থ হবে এগুলোকে স্বীকৃতিদানে এক ধরনের ব্যর্থতা। এগুলো মানব মর্যাদার দাবিদাওয়ার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আর প্রথমত: দাবি করে বৈষয়িক ও আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ব্যক্তির অত্যাবশ্যকীয় চাহিদাগুলোর পূরণ। 'এ সকল অধিকার জীবনের প্রতিটি স্তরে এবং প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিস্থিতির সঙ্গে খাপ হয়। এগুলো একসাথে মিলে গঠন করে একটি ঐক্য, যা দ্ব্যর্থহীনভাবে ব্যক্তি ও সমাজ উভয়ের মঙ্গলকর প্রতিটি দিক প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে নিয়োজিত।'" এগুলো সর্বাত্মকভাবে পালিত হচ্ছে এটা নিশ্চিত করার জন্য মানবাধিকারগুলোকে অবশ্যই প্রতিটি সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত ও এগুলোর আইনগত রূপরেখা বলিষ্ঠ হতে হবে (১৫৪)। (খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার) সংক্ষিপ্তসার মানবাধিকারের কিছু তালিকা প্রদান করে (যেমন, ১৫৫, ১৬৬ ও ১৩০) এবং অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে পারস্পরিক পরিপূরকতার উপর জোর দেয়। "মানব সমাজে, একজন ব্যক্তির অধিকার অন্য সকল ব্যক্তির কর্তব্যের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ : যেমন, বর্তমান প্রসঙ্গে আলোচ্য অধিকারকে স্বীকার ও সম্মান করা কর্তব্য" (১৫৬)।

সংক্ষিপ্তসার জনগণ ও জাতির অধিকার সম্পর্কে এ বিষয়গুলোও তুলে ধরে : "জনগণ ও জাতির অধিকারসমূহকে অন্তর্ভুক্ত করার লক্ষ্যে মানবাধিকারের ক্ষেত্রের সম্প্রসারণ ঘটেছে।" আন্তর্জাতিক আইন এ নীতির উপর ভিত্তি করে : সকল রাষ্ট্রের সমান সম্মান, সকল মানুষের আত্মসিদ্ধান্ত, স্বাধীনতার অধিকার এবং "মানবতার উচ্চতর সাধারণ মঙ্গলের পরিপ্রেক্ষিতে অবাধ সহযোগিতার" অধিকার। "জাতিপুঞ্জের অধিকারগুলো 'মানবাধিকার' ছাড়া কিছুই নয়। একটি জাতির রয়েছে 'অস্তিত্বের', 'এর নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি, যেগুলোর মধ্য দিয়ে এটা এর মৌলিক আধ্যাত্মিক সার্বভৌমত্ব প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠিত করে', এবং 'এর নিজস্ব ঐতিহ্যের অনুসরণে নিজ জীবন গঠনের মৌলিক অধিকার' " (১৫৭)।

"মানবাধিকার রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা তার অন্যতম অত্যাবশ্যকীয় ধর্মীয় প্রেরণদায়িত্ব এ ব্যাপারে অবগত থেকে খ্রীষ্টমণ্ডলী 'গভীর শ্রদ্ধার সাথে আজকের যে গতিশীল প্রক্রিয়া সর্বত্র এ সকল অধিকারকে অনুপ্রাণিত করছে সেই তাকে সমর্থন যোগায়।' খ্রীষ্টমণ্ডলী তার নিজের ব্যবস্থাসমূহের মধ্যে ন্যায্যতা ও মানবাধিকারকে সম্মান করার প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে অনুভব করে।" অধিকতর কার্যকারিতার আশায়, মানবাধিকারের প্রতি খ্রীষ্টমণ্ডলীর আত্মনিয়োজন 'আন্তমাণ্ডলিক সহযোগিতার, অপরাপর ধর্মের সঙ্গে সংলাপের, এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোর সঙ্গে উপযুক্ত যোগাযোগের ক্ষেত্রে উন্মুক্ত" (১৫৯)।

মানবাধিকার ও কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূল্যবোধের মধ্যে সম্পর্ক বিষয়ক কিছু অনুচ্ছেদের উল্লেখ সহায়ক হতে পারে। (খ্রীষ্টমণ্ডলীর সামাজিক শিক্ষার) সংক্ষিপ্তসার সব

মানুষের সমান মর্যাদার উপর জোর দেয়। " 'ঈশ্বর সত্যিই কারও প্রতি কোন পক্ষপাত করেন না' (শিষ্যচরিত ১০:৩৪, রোমীয় ২:১১; গালাতীয় ২:৬; এফেসীয় ৬:৯), কেননা তাঁর প্রতিমূর্তিতে ও সাদৃশ্যে সৃষ্ট জীব হিসেবে সব মানুষ একই মর্যাদার অধিকারী।...'তোমাদের মধ্যে এখন ইহুদীও নেই, অইহুদীও নেই, ক্রীতদাসও নেই, স্বাধীন মানুষও নেই; পুরুষও নেই, নারীও নেই; কারণ খ্রীষ্ট-যীশুর সঙ্গে মিলিত হয়ে এখন তোমরা সকলেই এক হয়ে আছ' (গালাতীয় ৩:২৮; দ্র: রোমীয় ১০:১২, কলসীয় ৩:১১)।" ঈশ্বরের সামনে প্রতিটি ব্যক্তির মর্যাদা অন্যান্য মানুষের সামনে একজন মানুষের মর্যাদার ভিত্তি।...এটাই হচ্ছে জাতি, গোষ্ঠী, লিঙ্গ, উৎস, সংস্কৃতি কিংবা শ্রেণী নির্বিশেষে সকল মানুষের মাঝে মৌলিক সমতা ও ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি" (১৪৪)।

তার সামাজিক ন্যায্যতা ও প্রেম ভাবনায়, খ্রীষ্টমণ্ডলীকে অবশ্যই "দরিদ্রদের, অন্ততপক্ষে দুর্বলদের অস্বীকৃত ও লঙ্ঘিত অধিকার" (৮১) রক্ষায় এগিয়ে আসতে হবে। "সাধারণ মঙ্গলের দাবিগুলো... ব্যক্তি ও তার মৌলিক অধিকারগুলোর প্রতি সম্মান ও এগুলোর সার্বিক উন্নয়নের সাথে গভীরভাবে সংযুক্ত" (১৬৬-৭)। "সংহতি প্রকাশ করে...ব্যক্তির সহজাত সামাজিক প্রকৃতি, মর্যাদা ও অধিকারের ক্ষেত্রে সকলের সমান অধিকার, একটি অনেক বেশী অঙ্গীকারবদ্ধ ঐক্যের উদ্দেশে ব্যক্তি ও জাতির অভিন্ন পথ" (১৯২)।

৪। মানবাধিকার বিষয়ক আরও গুরুত্বপূর্ণ STC ভাবনা

খ্রীষ্টমণ্ডলীর ব্যর্থতাসমূহ

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে, ন্যায্যতা ও শান্তির জন্য পোপীয় পরিষদ সুস্পষ্ট ভাষায় কাথলিক মণ্ডলীর ব্যর্থতার কথা স্বীকার করে: "আমরা সবাই বেশ অবগত যে, বিগত দু'টি শতকে মানবাধিকারের প্রতি খ্রীষ্টমণ্ডলীর মনোভাব উদারবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষবাদের দৃষ্টিকোণ থেকে করা যে-কোন মানবাধিকার ঘোষণার মুখে...প্রায়ই ইতস্ততা, বিরোধিতা, নিবৃত্ত আর, বিশেষ ক্ষেত্রে, এমনকি উগ্র প্রতিবাদমুখরতা দ্বারা বৈশিষ্টমণ্ডিত ছিল।" তথাপি, বিশেষ করে বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে, মণ্ডলীতে পরিবর্তন এসেছে : "আধুনিক সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশে অনুপ্রাণিত হয়ে, খ্রীষ্টমণ্ডলী... এমন এক মনোভাব গ্রহণ করেছে যা নেতিবাচক ও অগ্রাহ্য না হয়ে বরং ইতিবাচক ও উৎসাহব্যাঞ্জক। খ্রীষ্টমণ্ডলী সর্বোপরি এ উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছে যে, "মানবাধিকারের স্বীকৃতি ও রক্ষা সামাজিক, রাজনৈতিক, ও অর্থনৈতিক পরিবর্তনের প্রয়োজানীয়তার সঙ্গে অনেক বেশী অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত।" এইভাবে, সকল খ্রীষ্টীয় মণ্ডলীগুলোর রয়েছে "কাঠামোগত নানা পবিরর্তন ও রাজনীতির উদ্দেশে" "একটি সমষ্টিগত দায়িত্ব"। মণ্ডলীর ক্রিয়াশীলতার লক্ষ্য যে শুধুমাত্র তার নিজ অধিকারগুলো ও তার জনগণকে রক্ষা করা তা নয়, কিন্তু পাশাপাশি "সাধারণ মানব স্বভাব ও প্রাকৃতিক বিধানের ভিত্তিতে সকলের অধিকারকে রক্ষণাবেক্ষণ করা"ও হচ্ছে এর লক্ষ্য।

মণ্ডলীসমূহের বিশ্ব পরিষদ (WCC) "মানবাধিকার" প্রকাশভঙ্গির কোন রকম ব্যবহার না ঘটিয়েও এর মূল্যায়নে অনেক বেশী কড়া : "আমাদের মণ্ডলীগুলো অনেক সময় শাসক শ্রেণী, গোষ্ঠী ও রাজনৈতিক দলগুলোর বিশেষ প্রাধিকারকে ধর্মীয় ছাড় দিয়েছে, এইভাবে তারা সামাজিক ন্যায্যতা ও রাজনৈতিক স্বাধীনতার স্বার্থে অপরিহার্য নানা পরিবর্তনের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বাধার সম্মুখীন হয়েছে। অনেক সময় তারা তাদের শিক্ষা ও তাদের দায়িত্বের সম্পূর্ণরূপে আধ্যাত্মিক কিংবা অন্য-জাগতিক অথবা আত্মকেন্দ্রিক ব্যাখ্যার প্রতি মনোযোগ দিয়েছে। তারা অনেক সময় তাদের চারপাশের সমাজকে গঠনদানকারী শক্তিগুলোকে বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে, এই কারণে তারা অপ্রস্তুত ছিল নতুন নতুন সমস্যা সৃজনশীলতার সঙ্গে মোকাবেলা করার..." (আমস্টারডাম সম্মেলন, ১৯৪৮, ৪৪৬-৭)। "কিছু কিছু ঘটনায়, মণ্ডলীগুলো নিজেরাই নিপীড়নকারীদের সক্রিয়ভাবে সমর্থন যুগিয়েছে অথবা সমভাবে খোদ নিপীড়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে, আর তা করেছে বিভ্রান্ত বিশ্বাসে অথবা তাদের নিজস্ব সুবিধা হাসিলের জন্য" (নাইরোবী সম্মেলন, ১৯৭৫, ৫৩০)।

মানবাধিকারের জন্য অঙ্গীকার এবং বিভিন্ন গণ-আন্দোলন

১৯৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় ভাটিকান মহাসভা ঘোষণা করেছে : "তার নিকট প্রদত্ত মঙ্গলসমাচারের গুণেই মণ্ডলী মানুষের অধিকারসমূহ ঘোষণা করে। বিশ্বের সর্বত্র এসব অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য বর্তমানে যে গতিশীল প্রক্রিয়ায় কাজ চলছে তা মণ্ডলী স্বীকার করে এবং তার প্রতি সে শ্রদ্ধাশীল" (বর্তমান জগতে খ্রীষ্টমণ্ডলী, ৪১-৪১, ১৪৮-৯)। ১৯৬৮ খ্রীষ্টাব্দে মেডেলিনে, লাতিন আমেরিকার বিশপগণ এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন যে, মণ্ডলী "জনগণের তাদের অধিকার সংশোধন ও দৃঢ়করণ এবং খাঁটি ন্যায্যতার অন্বেষণের লক্ষ্যে তাদের নিজস্ব তৃণমূল পর্যায়ের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠা ও গড়ে তোলার নানা রকম প্রয়াসকে উৎসাহিত করবে ও সহায়তা যোগাবে।" "জাগ্রত ও সংগঠিত সমাজের গতিময়তাকে যেন ন্যায্যতা ও শান্তির সেবায় নিয়োগ করা হয়, তা আমরা আন্তরিকভাবে কামনা করি" (শান্তি, ২৭ এবং ১৯, ২৩৫-৬)।

১৯৭৫ খ্রীষ্টাব্দে নাইরোবী সম্মেলনে, WCC একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে, "ঈশ্বরের ইচ্ছা ও তাঁর প্রেম সকল মানুষের জন্য এবং মানবাধিকারের জন্য খ্রীষ্টানদের সংগ্রাম যীশু খ্রীষ্টের প্রতি একটি মৌলিক সাড়াদান। মঙ্গলসমাচার আমাদের পথ দেখায় যেন আমরা আমাদের নিজস্ব সমাজগুলিতে মানবাধিকারের বিভিন্ন লঙ্ঘনকে চিহ্নিতকরণ ও সংশোধনে আরও বেশী সক্রিয় হই, যেন আমরা" খ্রীষ্টানদের সঙ্গে এবং "অন্যান্য ধর্ম ও মতাদর্শে বিশ্বাসীগণ, যারা আমাদের সঙ্গে একই মানব মর্যাদার ভাবনা পোষণ করে, তাদের সঙ্গে সংহতির নতুন নতুন ধরনে প্রবশ করি...। যখন আমরা নির্যাতনের ন্যায় মানবাধিকারের সুনির্দিষ্ট অস্বীকার বা প্রত্যাখ্যানের বিলোপসাধনের জন্য কাজ করব, তখন আমাদের অন্যায্য কাঠামোসমূহের কথা মনে রাখতে হবে, যেমন– অর্থনৈতিক শোষণ, রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে ব্যবহার, শ্রেণী বৈষম্য। এগুলি মানবাধিকারকে অস্বীকার করার মত পরিস্থিতির সৃষ্টি করে। সুতরাং, মানবাধিকারের জন্য কাজ করার আরও অর্থ হচ্ছে সর্বাপেক্ষা মৌলিক পর্যায়ে অন্যায্য কাঠামোবিহীন সমাজের জন্য কাজ করা।"

WCC আরও উল্লেখ করে যে, মানবাধিকার লঙ্ঘনের মৌলিক কারণগুলি "লক্ষ্য করা যায়, অন্যায্য সামাজিক ব্যবস্থায়, ক্ষমতার অপব্যবহারে, অর্থনৈতিক উন্নয়নের অভাবে, এবং অসম উন্নয়ন ব্যবস্থায় রয়েছে। এই পরিস্থিতি সুবিধাবঞ্চিতদের ঠেলে দেয় অন্যায্য আইন লঙ্ঘন ও বিদ্রোহ করার দিকে, যার প্রতি 'আইন-শৃঙ্খলার' সাথে জড়িত রাজনৈতিক ও মিলিটারি শক্তিগুলো নিষ্ঠুর দমননীতির মাধ্যমে সাড়া দেয়।" বিভিন্ন রকম সুপারিশে, মানবাধিকার বিষয়ক রিপোর্ট উল্লেখ করেছে, "তাদের নিজস্ব অধিকারের জন্য লোকদের তরফ থেকে সংগ্রাম মূলগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ। স্থানীয় পর্যায়ের পরিষদগুলোকে তাদের নিজ নিজ সমাজে মানবাধিকারসমূহের লঙ্ঘনগুলিকে চিহ্নিতকরণ, দলিলবদ্ধকরণ ও সংগ্রামের ক্ষেত্রে অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে উঠতে হবে। তারা এবং তাদের জাতীয় মণ্ডলীগুলো জনগণ, দল ও ব্যক্তিবর্গের তাদের নিজস্ব বৈধ অধিকারের জন্য সংগ্রামকে সমর্থন যোগানোর লক্ষ্যে নতুন নতুন উপায়ের খোঁজ করবে, এগুলো তাদেরকে তাদের সংগ্রামে পরস্পরকে বলীয়ান করার মানসে সংহতির বিভিন্ন নেটওয়ার্ক গড়ে তুলতে সহায়তা করবে" (Reports on Human Rights, # 12-13, 31-3 & 81, 528-30)।

১৯৭০ খ্রীষ্টাব্দের নভেম্বরে ম্যানিলা সম্মেলনে তারা আরও উল্লেখ করেছেন, "আমরা অন্যান্য ধর্মবিশ্বাসী মানুষ, অন্যান্য খ্রীষ্টান এবং সদিচ্ছাসম্পন্ন সকল মানুষের পাশাপাশি, মানবাধিকারের বাস্তবায়নকে সমর্থন ও প্রতিষ্ঠিত করার এবং যেখানেই, যখনই, ও কারোর দ্বারা এগুলো লঙ্ঘিত হয়, তখনই এগুলোকে রক্ষা করার সঙ্কল্প করি। আমরা সঙ্কল্প করি যেন শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষিজীবিগণ সমাজে তাদের অধিকার চর্চা ও রক্ষা করতে পারে, এ জন্য তাদের সক্ষম করে তোলার লক্ষ্যে তাদের ভাগ্যকে আমাদের বিশেষ ভাবনায় রূপ দেওয়ার, বিশেষ করে তাদের শিক্ষায় ও সংগঠনে সহায়তা করার জন্য... আমরা সঙ্কল্প করি সকলের জন্য জীবিকার মৌলিক মাধ্যমসমূহের নিশ্চয়তাবিধানে সাহায্য করার। এই প্রেক্ষিতে, ভূমি এবং আমাদের নিজেদের দেশসহ পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অন্যসব সম্পদের সুষম বণ্টনের ও সামাজিক দিক থেকে দায়িত্বশীল ব্যবহারের উদ্দেশে নিজেদের সর্বান্তকরণে নিয়োজিত করার।" তাদের বিভিন্ন দলিলের বিষয়বস্তুর মূল কথা সংক্ষেপে তুলে ধরে Desrochers এই ব'লে

শেষ করেছেন, এশীয় বিশপগণ "এশিয়ার মণ্ডলীকে সকল সদিচ্ছাসম্পন্ন মানুষের সহযোগিতায় দরিদ্রদের একটি সত্যিকার মণ্ডলী, অর্থাৎ, দরিদ্রদের সঙ্গে সংহতিতে এবং মানবাধিকার ও সামাজিক ন্যায্যতার সেবায় একটি মণ্ডলী, হয়ে ওঠার লক্ষ্যে নিজেদের উৎসর্গ করেছেন" (Desrochers, 381& 402, quoting Resolution 2-5)।

১৯৭৭ খ্রীষ্টাব্দে, এশীয় খ্রীষ্টীয় সম্মেলনের (CCA) পেনাং সম্মেলনে উল্লেখ করা হয় যে, মানবাধিকার আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসার আজ্ঞার মতই মঙ্গলসমাচারের এবং পুরাতন নিয়মের মহাযাত্রার মত আমাদের ঐতিহ্যের একটি নিবিড় অংশের মৌল দিক।...নর ও নারী যখন দাসত্বমুক্ত, তখন মশীহরাজের রাজ্যের উদ্দেশে তাদের তীর্থযাত্রা চলতে থাকে। "এশিয়ায় লক্ষ লক্ষ লোকের পরিমিত খাদ্যের মৌলিক চাহিদার অস্বীকৃতি মানবাধিকার লঙ্ঘনের গুরুতর অপরাধ।' "CCA-এর উচিত ...এর নানা কার্যক্রমের মধ্য দিয়ে মানবাধিকারকে অগ্রাধিকার প্রদান করা (৬১-২)।

খ্রীষ্টমণ্ডলী এবং বিভিন্ন জনসংগ্রাম

১৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে WCC মেলবোর্ণ সম্মেলনে ঈশ্বরের রাজ্য ও মানব সংগ্রামের উপর আলোকপাত করা হয়। মণ্ডলীগুলোর "আশু প্রয়োজন চলমান যত মানব সংগ্রামে পুরোপুরি সামিল হওয়ার।" মঙ্গলসমাচার "এই জগতে সংগ্রামের সঙ্গেই যুক্ত।...মণ্ডলীসমূহের প্রাবক্তিক দায়িত্ব হল উপলব্ধি করা, এ সকল সংগ্রামে ও (এগুলির) যত অভিপ্রায়ে... যেখানে ঐশরাজ্যের শক্তিগুলো কর্মরত এবং যেখানে ঐশরাজ্যের প্রতিনিদর্শনগুলো বাস্তবায়িত হচ্ছে। খ্রীষ্টমণ্ডলীকে অবশ্যই (তার) প্রাবক্তিক দায়িত্ব নতুন ক'রে সম্পাদনের এবং... ঈশ্বরের রাজ্যের কার্যকরী নির্দশন প্রতিষ্ঠার জন্য জাগ্রত হতে হবে। মণ্ডলীর রয়েছে একটি বাণী, যা সকল সংগ্রামকে অর্থবহ করে তোলে, রয়েছে একটি শিক্ষা, যা হচ্ছে সকল সংগ্রামের মধ্যে পুনর্মিলনের সম্ভাবনা বিষয়ক। মণ্ডলীগুলোকে অবশ্যই সেই শিক্ষা স্পষ্টভাবে ঘোষণা করতে হবে...।" "মানবাধিকারের জন্য সংগ্রামে অংশগ্রহণ নিজেই হচ্ছে, মণ্ডলীর সমগ্র প্রেরণদায়িত্বের একটি কেন্দ্রিয় দিক" (৩২ ১৯, ৫৬৮-৯)।

STC-এর কিছু অনুচ্ছেদও একই পথ ধরে এগিয়ে চলেছে। যেমন, ১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় বিশপগণ লিখেছেন, ঐশপরিকল্পনা "দেশের জনগণের সংগ্রামে ও বাসনায় সক্রিয়, তাদেরকে সব ধরনের বস্তুগত, সামাজিক ও আধ্যাত্মিক নিরাসক্ততা থেকে মুক্ত করছে" (CBCI, cf. De Souza, 19)। "শান্তি, মুক্তি ও ন্যায্যতার" পথ "দ্বন্দ্ব অনিবার্য করে তোলে"। "সকল পছন্দের দাবি ত্যাগস্বীকার, সকল পরিবর্তনের দাবি সংগ্রাম। মঙ্গলসমাচারের ন্যায় এটাই তো হচ্ছে ইতিহাসের শিক্ষা" (1977&1978 WCC Reports, cf. Desrochers 549, 559 & 680-1)। CCA ১৯৮১ খ্রীষ্টাব্দে আরও উল্লেখ করে : "তাঁর জাগতিক জীবনকালে, যীশু সব সময় তাঁর সময়কার লোকদের পক্ষাবলম্বন করেছেন। তাঁর জীবন ও শিক্ষা দরিদ্র, নির্যাতিত ও বঞ্চিতদের তাঁর সমর্থনের স্পষ্ট নির্দশন... খ্রীষ্টের আশ্রয়ে জনগণের সঙ্গে বসবাস, এবং সমাজ হওয়ার আহ্বান, এটাই নির্দেশ করে যে, আমাদের কার্যক্রমগুলি অবশ্যই লোকদের সঙ্গে বসবাস ও কাজ করার উপর অধিকতর গুরুত্বারোপ করবে, অর্থাৎ দরিদ্র, নির্যাতিত ও সুবিধাবঞ্চিতদের সঙ্গে, যারা এশীয় জনগণের মধ্যে সংখ্যায় সংখ্যাগরিষ্ঠ।" খ্রীষ্টের আশ্রয়ে জনগণের সঙ্গে বসবাসের অর্থ যারা নির্যাতনের বলি তাদের পক্ষ নেওয়া ! (৬০৫)।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে, দক্ষিণ ভারতীয় মণ্ডলী ঘোষণা করে : "খ্রীষ্টমণ্ডলী আমাদের যুগের স্পষ্ট প্রতীয়মান অন্যায্য ও অমানবীয় সমাজের রূপান্তরে খ্রীষ্টের সঙ্গে সহযোগিতার (তার) দায়িত্বকে অস্বীকার করতে পারে না।" জেনেশুনেও "সমগ্র ব্যবস্থা বা পদ্ধতির রূপান্তরের জন্য" কাজ না করা "খ্রীষ্টের ভালবাসার পূর্ণতার চূড়ান্ত দাবিদাওয়ার মুখে একটি অপরাধধর্মী দায়িত্বহীনতা। নির্যাতিতদের পক্ষ নেওয়া, ন্যায্যতার জন্য সংগ্রামে সামিল হওয়া, জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে একে দরিদ্রদের দৃষ্টিকোণ থেকে সুসমাচারের আলোকে চালিত করাই হচ্ছে বর্তমান প্রেক্ষাপটে খ্রীষ্টমণ্ডলীর প্রধান আহ্বান" (৬২৬)। একইভাবে, ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুর সম্মেলনে ভারতীয় বিশপ সম্মিলনী উল্লেখ করে, "ভারতের মত দেশগুলিতে, ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠাকে প্রেরণদায়িত্বের একটি প্রধান প্রকাশ এবং একটি প্রৈরিতিক অগ্রাধিকাররূপে দেখা দরকার" (De Souza, 88)।

৫। মানবাধিকার বিষয়ক কিছু CBCI ভাবনা

এখানে মানবাধিকারের উপর ভারতীয় কাথলিক বিশপ সম্মিলনীর (CBCI) কিছু ভাবনার উপস্থাপন সহায়ক হতে পারে। ১৯৭২ খ্রীষ্টাব্দে ভারতীয় জনগণের নিকট এক আবেদনে, CBCI উন্নয়নের অধিকারের গুরুত্বের উপর আলোকপাত করেছিল : অনেক অন্যায্যতা আমাদের জনগণের কষ্টভোগের কারণ; এর মধ্যে গুরুতর হচ্ছে, তাদের উন্নয়নের অধিকারের বাস্তব অস্বীকৃতি। মনুষ্যত্বে বিকশিত হওয়া, তার ব্যক্তিগত মূল্যের উৎকর্ষসাধন এবং একজন অনেক বেশী ব্যক্তিময় হয়ে ওঠা প্রতিটি ব্যক্তির জন্মগত অধিকার। কিন্তু, এই অধিকার বাস্তবে আমাদের লক্ষ লক্ষ জনগণের বেলায় অস্বীকৃত হচ্ছে। এখানেই নিহিত সর্বাপেক্ষা গুরুতর অন্যায্যতা (De Souza, 14)।

১৯৭৪ খ্রীষ্টাব্দে CBCI এর Communication to the Synod of Bishops in Rome-এ উল্লেখ করেছে : উন্নয়নের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত সমগ্র ব্যক্তিসত্তা ও সমগ্র সমাজ। উন্নয়ন অর্থ পাপের প্রভাব থেকে, সব ধরনের নিপীড়ন ও অন্যায্যতা থেকে, এমনকি নীতিমালা ও কাঠামোসমূহের সৃষ্ট সেই সব বিষয় থেকে মুক্তি, যেগুলো পরোক্ষভাবে ধনী ও দরিদ্রদের মধ্যে ব্যবধানকে স্থায়ী রূপ দান করে। খ্রীষ্টমণ্ডলীর দায়িত্ব শুধুমাত্র অর্থনৈতিক নয়, কিন্তু আরও অধিক উন্নয়ন কর্মকে সঠিক দিকনির্দেশনা যোগানো, যেন তা অনেক বেশী লোকদের তাদের অধিকার সম্বন্ধে সচেতন করে তোলার একটি কাজ হয় এবং যারা প্রকৃত মানব অস্তিত্বের জন্য সংগ্রাম করে যাচ্ছে, সেই সব লোকদের সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ার একটি কাজ হয়ে ওঠে” (ঐ, ৩১-২)। ১৯৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, CBCI আরও উল্লেখ করে যে, খ্রীষ্টমণ্ডলী জগতে তার প্রেরণদায়িত্ব সুসম্পন্ন করতে পারবে না যদি সমগ্র ঐশজনগণকে তাদের দরিদ্রতার, বৈষম্যের ও নিপীড়নের পরিস্থিতি থেকে নিজেদের মুক্ত করার লক্ষ্যে নিজেদের সক্ষম করে তোলায় উদ্বুদ্ধ না করা হয় (৮৬)।

২০০২ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ এপ্রিল, CBCI কেন্দ্র একটি মানবাধিকার বিষয়ক CBCI দলিল প্রকাশ করে। প্রকাশিত দলিলটিতে পরিবেশগত অধিকারের উপর আলোকপাত করা হয়। পৃথিবী ধ্বংসের মূল্যে মানব উন্নয়ন গ্রহণযোগ্য নয়।... ভারতে ধরিত্রীর যত্নের সঙ্গে সংযুক্ত মানবাধিকারের ক্ষেত্রে আমরা বিভিন্ন প্রচেষ্টাকে সমর্থন জানিয়েছি : বন বাঁচানোর লক্ষ্যে শিপকো আন্দোলন, নদ-নদী বাঁচানোর লক্ষ্যে নর্মাদা বাঁচাও আন্দোলন, সমুদ্র ও জলজ প্রাণীদের রক্ষার লক্ষ্যে জাতীয় মৎস্য কর্মী ফোরাম। এ সকল আন্দোলনের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ পরিবেশের রক্ষায় এবং তাদের মূল্যবোধ ও পুরুষানুক্রমিক চলে আসা অধিকারের সমর্থনে জেগে উঠেছে। ঈশ্বরের পরিকল্পনা মত সবাই যেন পূর্ণতররূপে ও পর্যাপ্তভাবে জীবন পায়, এটা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রয়োজন জাতি, লিঙ্গ, ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানব পরিবারের মধ্যে শর্তহীন সংহতির। মানবাধিকারের রক্ষক খাঁটি মানবাধিকারকে পৃথিবী নামক গ্রহের সেবায় নিয়োজিত হতে হবে। আজকের দৃশ্যপট পৃথিবীর পৃষ্ঠদেশে বসবাসরত সকলকে আহ্বান জানাচ্ছে খোদ জীবনের জন্য, মানব জীবনের জন্য এবং পরিবেশের জীবনের জন্য একটি অগ্রাধিকার, পৃথিবী রক্ষা ও যত্নের জন্য, আর এইভাবে এ কাজের মধ্য দিয়ে, মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য অগ্রাধিকার গ্রহণের।

এই দলিলের নিম্নোক্ত অনুচ্ছেদটি এ আলোচনার একটি ভাল উপসংহার হতে পারে : মৌলিক মানবাধিকারসমূহের প্রতিষ্ঠা একটি সভ্য সমাজ হিসেবে জীবনধারণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। মায়ের কোল থেকে কবর পর্যন্ত মৌলিক মানবাধিকারগুলোর অস্বীকৃতি সভ্য সমাজের মৃত্যুর ঘন্টাধ্বনির মত শোনায়। আজকে অনেক দেশে এ রকম পরিস্থিতিই বিরাজ করছে। যখন মানবাধিকার লঙ্ঘনের সংখ্যা অগণিত, তখন সন্ত্রাসবাদ একটি অনিবার্য পরিণাম এবং সন্ত্রাসী বিচ্ছিন্ন জননয়াক হয়ে ওঠে। মৌলিক মানবাধিকার অস্বীকৃত হলে, মানব সমাজ নিজেকে মৃত্যুর যন্ত্রণার মধ্যে এবং মানব সভ্যতা নিজেকে ধ্বংসের উপকূলে আবিষ্কার করে।